দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

জ্যোতির্ময় কাশী আজ জগতের দীপ্তি
— পৃঃ ২৪

শিবাজীর আদর্শে জাতি গঠন করতে চেয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ
— পৃঃ ৩১

৭৪ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।। ১৫ ফাল্গুন - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

স্বমহিমায় বাবা বিশ্বনাথ

ভব্য কাশী দিব্য কাশী

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৮ ফেব্রুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতা রাজ্যে ‘কৌতূহল থাকা ভালো, তবে সীমা থাকা উচিত’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মদ-ময় বাংলা, ঘরে ঘরে হ্যাংলা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

অওয়ধ থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে অযোধ্যার পথে ◻ অসীম আলি ◻ ৮

আনিসের মৃত্যু ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিধান ঐক্যের পরিপন্থী ◻ বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ১১

রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র—একটি ঐতিহাসিক পত্র ◻ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৩

সিঙ্গুরে ভেড়িশিল্প এবং মাছেভাতে বাঙ্গালি ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৫

কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাস ◻ বেদ মোহন ঘোষ ◻ ১৭

দিব্য কাশী ভব্য কাশী ◻ অনামিকা দে ◻ ২৩

জ্যোতির্ময় কাশী আজ জগতের দীপ্তি ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৪

কিংবদন্তীর কাশী, কাশীর কিংবদন্তী ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৭

শিবাজীর আদর্শে জাতিগঠন করতে চেয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

তোমারই নাম সকল তারার মাঝে ◻ সারদা সরকার ◻ ৩৩

শিব-মাহাত্ম্য কথা ◻ রামানুজ গোস্বামী ◻ ৩৫

ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা হাইকোর্ট সার্ধশতবর্ষ অতিক্রম করার পথে ◻ সুবল সরদার ◻ ৪৩

মনুসংহিতার উৎস সন্ধানে ◻ স্বরূপ কুমার ধবল ◻ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ খেলা : ৩৮ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৭ মার্চ
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৭ মার্চ
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সাধারণ মেয়ে

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিনটি এলেই বারবার ঘুরেফিরে আসে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি। ক্ষমতায়ন অনেকগুলি শর্তের ওপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সর্বাগ্রে স্থান পায়। সারা ভারতের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ নারী শিক্ষার মাপকাঠিতে ঠিক কোথায়, কিংবা বাঙ্গালি মেয়েদের কর্মসংস্থানের ছবিটাই-বা কেমন— নারীর ক্ষমতায়নের আলোচনায় এসব প্রসঙ্গ উঠে আসবেই। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা জোর দিয়েছি মূলত গ্রাম ও জেলা শহরের সাধারণ মেয়েদের ওপর। এই সংখ্যায় লিখবেন নিখিল চিত্রকর, অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দিব্য কাশী ভব্য কাশী

সমগ্র বিশ্বের কাছে আধ্যাত্মিক দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের পরিচিতি রহিয়াছে। অধ্যাত্মবোধ এই দেশের মানুষের শ্বাসে প্রশ্বাসে । এই দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ দেশকে বিশেষভাবে নির্মাণ করিয়াছে। এই পবিত্র ভূমিতে মানুষ দেবতা হইয়াছে। তাই বলা হয় এই দেশ স্বয়ং ঈশ্বর নির্মাণ করিয়াছেন। এই দেশের প্রতিটি ধূলিকণায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। বলা হয় এই দেশের কঙ্করে কঙ্করে শঙ্কর রহিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। সমগ্র ভারতভূমি দেবাদিদেব শঙ্করের বিচরণ ভূমি। ইহার মধ্যে কাশী বা বারাণসী হইল শঙ্করের অধিষ্ঠান। তাই কাশী বিশ্বের প্রাচীনতম জীবিত জাগ্রত নগরী। কাশী ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক রাজধানী। চিরচৈতন্য কাশী ভারতবাসীর প্রাণস্পন্দন। কাশী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়তার প্রতীক। কাশীতে আদি শঙ্করাচার্য চণ্ডাল হইতে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তথাগত বুদ্ধ বোধি লাভ করিয়াছিলেন। রামানুজাচার্য রামময় হইয়াছিলেন। সন্ত রবিদাস গঙ্গামাতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। ভক্ত কবির তাঁর নির্গুণ রামকে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শত শত মহাপুরুষের সাধনক্ষেত্র এই কাশী। কাশীর কেন্দ্রবিন্দু হইলেন বাবা বিশ্বনাথ। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। যুগ যুগ ধরিয়া কাশীক্ষেত্রের অধিপতি বাবা বিশ্বনাথ। আপামর ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে কাশী বিশ্বনাথ বা কাশী বিশ্বেশ্বর বলিয়া জানেন। বিদেশি আক্রমণকারীরা এই দেশের আস্থা ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রগুলিকে বার বার ধ্বংস করিলেও ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মাকে তাহারা নষ্ট করিতে পারে নাই। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরও তাহারা বহুবার ধ্বংস করিয়াছে। অনতিকাল পরেই তাহা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরি, ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে জৌনপুরের মামুদ শাহ শার্কি, ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে সিকন্দর লোদি, ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আওরংজেব এই মন্দির ধ্বংস করিয়াছে। তৎস্থলে তাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু রাজা-মহারাজারা সময় সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। সর্বশেষ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকার মসজিদের পার্শ্বের জমি দখল করিয়া বাবা বিশ্বনাথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইহার ১৬৭ বৎসর পর দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ভব্যরূপের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কথা এই দেশের শাসকবর্গ ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির মোহে পড়িয়া বেমালুম ভুলিয়া বসিলেন। স্বাধীনতার সত্তর বৎসর পর ইতিহাস পার্শ্বপরিবর্তন করিয়াছে। আজি হইতে চারিশত বৎসর পূর্বে যে মন্দির আওরংজেবের ক্রূরতায় ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদ্যোগে আবার নবরূপ ধারণ করিয়া সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর ১৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা বিশ্বনাথ মন্দির ধামের লোকার্পণ সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে মহারানি অহল্যাবাঈয়ের ভক্তি এবং মহারাজা রণজিৎ সিংহের বীরত্ব অনুভব করিয়াছেন। বস্তুত কাশী বিশ্বনাথ ধাম কোনো একটি ধর্মীয় কেন্দ্রমাত্র নহে, ইহা ভারতের দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সংস্কার, সংঘর্ষ ও স্বাভিমানের প্রতীক। নবরূপে কাশী বিশ্বনাথ ধামের লোকার্পণ সাংস্কৃতিক চেতনার এক নবযুগের শুভারম্ভ। অযোধ্যা ও কাশী হইতে স্বাভিমানবোধের যে শঙ্খধ্বনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করিলেন তাহা শুধু ভারতবর্ষেরই নহে, সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী ভারতবর্ষীয়দের প্রাণে এক নব আশার সঞ্চার করিয়াছে।

সুভাষিতম্

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্মং ত্যজেন্নৈব মা নো ধর্মা হতোঽবধীৎ।।

ধর্মকে যে নাশ করতে চায়, ধর্ম তাকেই নাশ করে। ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাকে রক্ষা করে। তাই ধর্মকে কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। নষ্ট ধর্ম আমাদের যেন বিনাশ না করে।

মমতা রাজ্যে ‘কৌতূহল থাকা ভালো, তবে তার সীমা থাকা উচিত’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজ্য বনাম রাজ্যপাল সংঘাত তুঙ্গে। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় বনাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বৈরথ বল্গাহীন। রাজ্যপাল এখন শাসকদলের চোখে রাজ্যের প্রবলেম চাইল্ড। অজয় করের পরিচালনায় ‘হারানো সুর’ (১৯৫৭) ছবিতে কৌতূহলী সুচিত্রা সেনকে উত্তমকুমার বলেছিলেন, ‘কৌতূহল থাকা ভালো তবে তার একটা সীমারেখা থাকা উচিত’। মমতাও রাজ্যপালকে সেটাই বলতে চান। ছবিতে সুচিত্রা সেন শোনেননি। মনে হয় রাজ্যপাল ধনকড়ও শুনবেন না।

রাজ্যপাল সাংবিধানিক পদ। মুখ্যমন্ত্রীও তাই। তার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। অথচ এই দুই পদ ঘিরে অযাচিত ডামাডোল চালাচ্ছে বিজেপি আর তৃণমূল। রাজ্য রাজ্যপাল দ্বৈরথে তারা অকারণ সমর্থন আর আক্রমণের বল ঠেলাঠেলি করছেন। গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত করে তুলছে। সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে দুই পদের মর্যাদাহানি ঘটাচ্ছে।

যুক্তফ্রন্ট আর বামফ্রন্ট জমানায় এই হতভাগ্য চিত্র রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। শান্তিস্বরূপ ধবন, ধরমবীর, টিভি রাজেশ্বর, বি ডি পাণ্ডে (সিপিএম বলত বাংলা দমন পাণ্ডে) হয়ে গোপালকৃষ্ণ গান্ধী পর্যন্ত রাজ্য রাজ্যপাল বিরোধের নবতম সংযোজন মমতা বনাম ধনকড়ের লড়াই। রাজ্যে রাজ্যপাল ধনকড়ের প্রবেশ এমন সময় যখন মমতা বিজেপির সঙ্গে লোকসভা ভোটের লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলেন। ২০২১ রাজ্য ভোটে তা পুরোদস্তুর শুধরে নেন। রাজ্যপালের অতি সক্রিয়তা আর কাজকর্ম মমতাকে তাঁর প্রতি সন্দিহান করে তোলে। তিনি প্রশাসনের বিরাগভাজন হতে থাকেন। সংবিধান নিয়মানুসারে রাজ্য মন্ত্রীসভার সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যপালকে কাজ করতে হয়। তৃণমূল তাঁকে ‘পদ্মপাল’ বলে ডাকতে শুরু করে। রাজ্যপাল বাঁচাও রব তুলে বিজেপিও ময়দানে নেমে পড়ে।

রাজ্যের কাছ থেকে যে কোনো বিষয় তথ্য চাওয়ার অধিকার রাজ্যপালের রয়েছে। প্রশাসনিক বিষয় যে কোনো প্রশ্ন তিনি তুলতে পারেন। তাতে রাজ্যের অস্বস্তি বাড়লেও তাঁর কিছু করার নেই।

তবে সর্ববিষয় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ কতটা কাম্য তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ তথ্য চাওয়ার অধিকার আর হস্তক্ষেপের মধ্যে ফারাক রয়েছে। সংবিধান বেত্তা আর প্রশাসনিক কর্তারা তার নিদান দিতে পারেন। নীতিগতভাবে ফারাক একটাই— লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক মহলে অনেকের অভিযোগ রাজ্যপাল ধনকড় তাঁর লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যকে মিশিয়ে

রাজ্যের কাছ থেকে যে কোনো বিষয় তথ্য চাওয়ার অধিকার রাজ্যপালের রয়েছে। প্রশাসনিক বিষয় যে কোনো প্রশ্ন তিনি তুলতে পারেন। তাতে রাজ্যের অস্বস্তি বাড়লেও তাঁর কিছু করার নেই।

মমতাকে হেনস্থা আর প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছেন। সুপ্রিম কোর্টের দুঁদে আইনজ্ঞ ধনকড়। তাঁর লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য এত সহজে বোঝার নয় বলে আমার ধারণা। তিনি বিজেপির সাংসদও ছিলেন। শত্রুকে চিনে ফেললে সে আর শত্রু থাকতে পারে না। রাজনৈতিক মহল বিষয়টি অতি সরলীকরণ করছেন।

রাজ্যপাল ধনকড়কে সরাতে তৃণমূল সংসদে প্রস্তাব এনেছে। কলকাতা আদালতে একটি মামলা হয়েছে যা আদালত খারিজ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে বলেছেন ধনকড় সরতে সরতে আপনার অবসর হয়ে যাবে। তাঁর দাদা বিজেপি নেতা যিনি দুই রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন তথাগত রায় ধনকড় বিরোধী প্রস্তাব ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। রাজ্যপালের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত মমতা তামিলনাড়ুর স্টালিন ও তেলেঙ্গানার চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে জোট করছেন। সেখানেও এক সমস্যা। রাজ্যপাল ‘প্রবলেম চাইল্ড’। রাজ্যের কাজকর্মে সায় না দেওয়ায় ধবন ও ধরম বীরকে সরতে হয়। দু’বছরের মাথায় চলে যেতে হয় বি ডি পাণ্ডেকে। এক বছরের মধ্যে ফিরতে হয় রাজেশ্বরকে। পাঁচ বছর পূর্ণ করেন গোপাল গান্ধী। তবে শেষ বছরে সিপিএম সরকারের সঙ্গে সম্পর্কে এক ফোঁটা চোনা পড়ে।

প্রথম থেকেই মমতার সঙ্গে জগদীপ ধনকড়ের সম্পর্ক খারাপ। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের পর তাঁর প্রবেশ। তাহলে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগেই কি তাঁর বিদায় হতে পারে? সেটাই দেখার। □

মদ-ময় বাংলা, ঘরে ঘরে হ্যাংলা

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

দিদির এক সাফল্যগাথা শোনাতে চাই। আসলে দিদিকে হাততালি দিয়ে চিঠি লিখলেই ভালো হতো। কিন্তু হাজার লোক দিদি বলে যাঁকে সম্মান করে তাঁকে মদের কাহিনি শোনাতে চাই না। তাই আপনারাই ভরসা। একটা দারুণ খবর পেলাম। এগিয়ে বাংলা। শুধু বাংলা নয়, বিলিতি বিক্রিতেও এগিয়ে বাংলা। এখন দুয়ারে মদ প্রকল্প চালু হয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। সে উদ্‌যোগও পুরোমাত্রায় চলছে।

খবর বলছে, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্য আবগারি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে চলা আবগারি দপ্তর ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছে। রাজ্য সরকারের দাবি, চলতি আর্থিক বছরের শেষে লক্ষ্যমাত্রার থেকে অনেকটাই বেশি আয় হবে। তবে এ বারের আয় বৃদ্ধি ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের রেকর্ড ছুঁতে পারবে না। সেবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৭৮১.৩৮ কোটি টাকা। পরে তা কমিয়ে ৪,৭৮৮ কোটি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থবর্ষের শেষে দেখা যায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে আয়। ওই বছরে আবগারি দপ্তরের আয় ছিল ৯৩৪০.০৫ কোটি টাকা।

আবগারি দপ্তরের কর্তাদের দাবি, গত পাঁচ বছর ধরেই আবগারি দপ্তরের উপরে রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থার ভরসা বেড়েছে। কারণ, আয় বাড়ছে। বাম জমানার চেয়ে এগিয়ে তৃণমূলের বাংলা। দিদির বাংলা। তবে সহজে হয়নি। ক্ষমতায় এসেই শুরু হয় চেষ্টা। ফল পেতে বছর কয়েক লেগেছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের শুরুতে ঠিক করা লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি দপ্তর। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় ২০১৭ সাল থেকে। সেই বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই রাজ্যে দেশি ও বিলিতি মদের মূল ডিস্ট্রিবিউটার হিসেবে কাজ শুরু করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশন (বেভকো)। মানে সরকার নিজেই মদের ব্যবসায় নেমে পড়ে। আর তখন থেকেই আবগারি দপ্তরে আয় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। প্রথম বছর ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে দপ্তরের রাজস্ব আয় হয় ৯৩৪০.০৫ কোটি টাকা। এর পরের বছর ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে সেটাই বেড়ে হয় ১০,৫৯০.৭২ কোটি টাকা। সেবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০,৫০৩.৪১ কোটি টাকা।

একটা সময়ে রাজ্য আবগারি দপ্তর ৫০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নিয়েও তা ছুঁতে পারত না। কিন্তু এখন প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে আয়। প্রতিবারই লক্ষ্য ছাপিয়ে আয় হচ্ছে কীভাবে? একেই বলে দিদি ম্যাজিক। তৃণমূল কর্মীরাই তো বাজার ধরে রেখেছে। চাকরিবাকরির দরকার নেই। স্কুল কলেজও নয়। তোলা তুলে ঢুক ঢুক পিও, যুগ যুগ জিও।

আবগারি দপ্তরের দাবি, সম্প্রতি সরকারের তরফে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ায় সার্বিক ভাবে মদ বিক্রি বেড়েছে। করোনাকালে অনলাইনে মদ বিক্রিও রাজস্ব আদায়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দপ্তরের হিসেব মতো অনলাইনে নথিভুক্ত ক্রেতার সংখ্যা এখন প্রায় দেড় লাখ। সেই সঙ্গে সস্তায় দেশি মদের অনেকগুলি ব্র্যান্ড সম্প্রতি চালু হয়েছে এ রাজ্যে। ৩০০ মিলিলিটার মদের দাম সর্বনিম্ন ২৩ টাকা রাখা হয়েছে। আর তাতে নাকি গত কয়েক মাসে দেশি মদের বিক্রি উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ, সস্তায় বৈধ দেশি মদ পেয়ে অনেকেই চোলাইয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পানীয় থেকে সরে আসছেন। আহা, কী কৃতিত্ব!

শুধু তাই নয়, সম্প্রতি মদের বিক্রি বাড়াতে বিতরণ ব্যবস্থা (ডিস্ট্রিবিউশন চেন) শক্তিশালী করার কথা ভাবছে আবগারি দপ্তর। বেভকো-র গুদাম থেকে খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে মদ পৌঁছানো, সুষ্ঠু শৃঙ্খল গড়ে তুলতে আর্থিক ভাবে বলিষ্ঠ ডিস্ট্রিবিউটার নিয়োগের কথা ভাবছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, এজন্য ইতিমধ্যেই আগ্রহীদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়েছে। তাতে এমনটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন সংস্থাকেই পরিবহণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হবে, যার ভারতের যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মদ ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসায় কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই সঙ্গে গত তিন বছরে কমপক্ষে ১৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে হবে। এখন শুনছি আরও আরও ডিস্ট্রিবিউটার নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। আর তাতে আগামীদিনে জোর গলায় বলা যাবে, আমরা এগিয়ে। দিদির বাংলা শুধু এগিয়ে নয়, ছুটছে। □

অতিথি কলম

অসীম আলি

অওয়ধ থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে অযোধ্যার পথে

প্রথম দুটি পর্বের নির্বাচন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে উত্তর প্রদেশের এই বিধানসভা নির্বাচন নিশ্চিতভাবেই দুটি মেরুর মধ্যে আবদ্ধ। পরবর্তী পর্বগুলি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে নির্বাচনের ফলাফলের গতি কোন দিকে ঝুঁকছে। বিজেপির হিন্দুত্বের রথের চাবিই শেষ কথা নাকি সমাজবাদী পার্টির পিছিয়ে পড়া জাতি সমীকরণ অধিক প্রভাবশালী।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের ৩, ৪, ও ৫ নং পর্বের ১৭৯টি আসনেই পরীক্ষিত হবে সমাজবাদী পার্টি মূলত যাদব অধ্যুষিত মৈনপুরী, এটা, কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চলে যাদবদের এককাট্টা সমর্থন কতটা পুনরুদ্ধার করতে পারবে, অন্যদিকে বিজেপির বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের ওপর আধিপত্যও নজরে আসবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সকলের লক্ষ্য এখন মধ্য উত্তরপ্রদেশের অওয়ধ অঞ্চল যাকে উত্তরপ্রদেশের হৃদযন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথম দুটি পর্বের কড়া লড়াইয়ের পর বিজেপি এই তিনটি মধ্যবর্তী পর্বে বাড়তি সমর্থন নিজেদের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে, কেননা এই অঞ্চলটিই দলের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সর্বাপেক্ষা প্রভাবের ক্ষেত্র। এই ১৭৯ আসন সংবলিত তিনটি পর্বের প্রথমটি ২০ ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন হয়েছে, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ৩টি ভিন্ন চরিত্রের ভৌগোলিক অবস্থান— (১) মধ্য দোয়াব, (২) অওয়ধ, (৩) বুন্দেলখণ্ড।

এই পর্বটির মধ্যে রয়েছে যাদব সংখ্যাগরিষ্ঠ মৈনপুরী, ফিরোজাবাদ, এটা, ফারাক্কাবাদ ও কনৌজের মতো বিধানসভাগুলি। বিগত নির্বাচনে এখানে যাদব দাপট একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। ২০টির মধ্যে তারা পেয়েছিল মাত্র ৬টি আসন। তাদের দল আশা করছে কাকা শিবপাল যাদবের সঙ্গে মিটমাট করে মৈনপুরী লোকসভার অন্তর্গত করহল থেকে প্রথম নির্বাচন লড়ার সিদ্ধান্ত অখিলেশকে ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে।

যদি বিজেপি এই যাদব অঞ্চলে আশানুরূপ ফলাফল না করতে পারে সেক্ষেত্রে দক্ষিণ বুন্দেলখণ্ড থেকে তাদের তা পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। এখানকার ঝাঁসি, জালোন, ললিতপুরে বিজেপির আধিপত্য প্রশ্নাতীত। গত বিধানসভায় বিজেপি এই অঞ্চলের ১৯টি বিধানসভার সবকটিতে বিজয়ী হয়েছিল।

এই রুখা-শুখা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেচক্ষেত্র ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে গোটা অঞ্চলটিকে সামগ্রিকভাবে বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি একটি নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে। অতীতে বহুজন সমাজ পার্টির গড় বলে পরিচিত এখানকার জেলাগুলিতে এবারে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা। তবে সমাজবাদী ও বসপার থেকে বিজেপি কিন্তু জেতার দৌড়ে এগিয়ে।

চতুর্থ পর্বের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে রাজধানী লক্ষ্ণৌর লড়াই। উল্লেখযোগ্য ভাবে বিগত তিন দশক ধরে রাজধানী অঞ্চল সম্পূর্ণ ভাবে বিজেপির সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এবারে লখীমপুর-খেরী কাণ্ড ও কৃষক আন্দোলনে অংশ নেওয়া পিলভিট অঞ্চলে বিজেপির বাড়তি সমস্যা রয়েছে মেনকা ও বরুণ গান্ধীর ঠাণ্ডা বিদ্রোহ।

আর বলতে দ্বিধা নেই পঞ্চমপর্বের আধ্যাত্মিকভাব বিকশিত পবিত্র শহর অযোধ্যা ও প্রয়াগরাজ অঞ্চলে বিজেপির শঙ্খনাদ শোনা এক প্রকার নিশ্চিত। রামমন্দির নির্মাণের যুক্তিযুক্ত সাফল্য নিয়ে বিজেপি'র উচ্চমাত্রার প্রচারের প্রভাব এখানকার সংলগ্ন এলাকাগুলির ওপরও যে পড়বে তা এক প্রকার নিশ্চিত। অবশ্য সমাজবাদীরা বহরাইচ ও শ্রাবস্তীর আসনগুলিতে সাফল্য আশা করছে কেননা এখানে নির্বাচকমণ্ডলীর এক তৃতয়াংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের।

'অওয়ধ' অঞ্চলেই অবশ্য সমাজবাদী পার্টির চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে যে তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের যথার্থভাবে একটি ছাতার তলায় সঠিকভাবে আনতে পেরেছে কি না? তাদের নতুন জোট পরীক্ষায় আর এল ভি-কে সঙ্গী করে মুসলমানরা ছাড়া জাট ভোট নিজেদের দিকে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় আনতে পারে তাহলে প্রথম দুটি পর্বের যাদবরা ছাড়া অন্য ওবিসি (আদার

ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট) ভোটের খামতি পুষিয়ে নিতে পারে।

অওয়ধ অঞ্চলে মুসলমান ও জাটদের মিলিত ভোটার সংখ্যা ১৫ শতাংশের আশপাশে থাকে বেশিরভাগ বিধানসভায়। এর ফলে সমাজবাদী পার্টি অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর যেমন কুর্মি, খুশওয়া, শাক্য, লোধ ও নিশাদদের ব্যাপক সমর্থন যদি জোটাতে পারে তবেই তাদের ভাগ্য খুলতে পারে। তাদের ছোটোখাটো জোটসঙ্গী মহান দল ও আপনাদল (কে)-এর সমর্থনও এখানেই পরীক্ষিত হবে।

উদাহরণ হিসেবে কুর্মি ভোটারদের প্রসঙ্গ দেখা যাক। অওয়ধ অঞ্চলের বহু বিধানসভা কেন্দ্রে এরা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম। বিশেষ করে উন্নাও, লখীমপুর খেরী, হরদই ও বরাবাঁকি। উত্তরপ্রদেশে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ এই কুর্মি সম্প্রদায় (যাদবদের পর) বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দলের দিকে তাদের সমর্থন দেওয়া নেওয়া করে। বাস্তবে তাদের স্থানীয় নেতারা যেদিকে নিয়ে যায় তারা সেই দলের পেছনেই দাঁড়ায়। এই সূত্রে গত নির্বাচনে বিজেপি সামগ্রিকভাবে আপনাদল (এস)-এর মাধ্যমে ৫৭ শতাংশ কুর্মি ভোট তাদের দিকে নিয়ে আসতে সফল হয়েছিল।

এবারে কিন্তু সমাজবাদী দল নামে ভারী লালজী ভার্মা, রাম অচল রাজভর বা রামপ্রসাদ চৌধুরীর মতো কুর্মি নেতাকে নিজেদের জোটসঙ্গী করেছে। যদিও এই মাতব্বরদের অধিকাংশ পূর্বাঞ্চলেই বেশি প্রভাবশালী। কিন্তু এদের সংযুক্তির মাধ্যমে সমাজবাদীরা তাদের কেবলমাত্র জাতিগতভাবে যাদব দলের তকমা থেকে বেরিয়ে অনেককে নিয়েও চলতে সক্ষম এমন একটা সংকেত দিতে চায়। একই সঙ্গে তাদের জাতিভিত্তিক জনগণনার দাবিও এই সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

আরও একটি ফলাফল ওলটপালট করে দেওয়ার ক্ষমতাধর সম্প্রদায় হলো 'পাসী'। দ্বিতীয় বৃহত্তম দলিত জাতির জনঘনত্ব 'অওয়ধ' অঞ্চলে সর্বাধিক। বিগত নির্বাচন থেকেই বিজেপি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের ব্যাপক সংখ্যায় বিজেপিকে ভোট দেওয়ার ফলেই বস্তুত 'অওয়ধ' অঞ্চলে মায়াবতীর দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একইসঙ্গে এদের জন্য বহু ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে চালু করতে পারায় বিজেপি 'পাসী' সম্প্রদায় ও জাট বহির্ভূত দলিত নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন অবশ্যই আশা করছে।

অবশ্য এছাড়াও ১১ শতাংশ ব্রাহ্মণ, ৮ শতাংশ রাজপুত অধ্যুষিত অওয়ধ ক্ষেত্রে আরও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় রয়েছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তথাকথিত প্রচারিত বিজেপির প্রতি বিক্ষুব্ধ মানসিকতার বিষয়টি অন্যতম। তারা কি চিরাচরিত পথ বর্জন করে বিজেপির বিরুদ্ধাচরণ করবে, না বরাবরের মতোই দলের পাশে দাঁড়াবে? এক্ষেত্রে বিজেপিকে সাহায্য করবে কংগ্রেস দলের দীর্ঘকালীন হতশ্রী অবস্থা। অন্য কোনো শক্তিশালী সংগঠন যুক্ত রাজ্যে হয়তো কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ভোট ভাগাভাগির সম্ভাবনা থাকত। দশ বছরের কিছু আগে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই 'অওয়ধ' অঞ্চল থেকে কংগ্রেস নজরে পড়ার মতো ৮টি আসন জিতেছিল। এর পেছনে ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রবল সমর্থন। এই নির্বাচনে অবশ্য কংগ্রেস তার 'কোমায়' চলে যাওয়া অবস্থাতেই থাকবে। এমনকী রায়বেরিলি বা আমেথি আসনও তাদের পক্ষে জেতা কঠিন।

প্রথম দুটি চরণের নির্বাচন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে উত্তর প্রদেশের এই বিধানসভা নির্বাচন নিশ্চিতভাবেই দুটি মেরুর মধ্যে আবদ্ধ। পরবর্তী তিনটি পর্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে নির্বাচনের ফলাফলের গতি কোন দিকে ঝুঁকছে। বিজেপির হিন্দুত্বের রথের চাবিই শেষ কথা নাকি সমাজবাদী পার্টির পিছিয়ে পড়া জাতি সমীকরণ অধিক প্রভাবশালী তা এই 'অওয়ধ' অঞ্চলেই নির্ধারিত হবে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

শোকসংবাদ

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি খণ্ড কার্যবাহ গোপীনাথ বসাকের মাতৃদেবী গীতারানি বসাক গত ১৫ ফেব্রুয়ারি

পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বর্ধমান জেলার হটকানপুরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্ব প্রচারক সমীরণ মাজীর মাতৃদেবী গত ৯ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

আনিসের মৃত্যু ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতা

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা ছাত্রনেতা আনিস খানের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য ক্রমাগত দানা বাঁধছে। বিশেষ করে তার মৃত্যুর দিন রাতে যারা তার বাড়িতে গিয়েছিল, তারা পুলিশ বলে পরিচয় দিলেও তারা আদৌ পুলিশই ছিল কি না, নাকি সত্যিই পুলিশ ছিল যাবতীয় রহস্য এখন তা নিয়েই। আনিসের পরিবার জানিয়েছে, তারা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওপর কোনও ভরসা রাখতে পারছেন না, তারা সিবিআই তদন্তই চান। এদিকে এই প্রতিবেদন যখন লিখছি তখন আনিসের মৃত্যুর ঘটনায় তিন পুলিশকর্মী সাসপেন্ড হওয়ার সংবাদ তুলে ধরে একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্রেকিং দেখাচ্ছে, ওইদিন ওই খুন হওয়া যুবকের বাড়িতে পুলিশই গিয়ে তাকে খুন করেছিল।

ঘটনার গতিপ্রকৃতি কোনদিকে যায়, সেদিকে নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য থাকবে। একথা অনস্বীকার্য, আনিসের মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এবং এর নিরপেক্ষ তদন্তও হওয়া দরকার। নিরপেক্ষ তদন্ত পুলিশকে দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়, কারণ অভিযোগের আঙুল তাদেরই দিকে। সুতরাং অভিযুক্ত যখন অভিযোগের তদন্তভার পায়, তখন সেই তদন্তের কী হাল হয় তা সহজেই অনুমেয়। ফলে নিরপেক্ষ তদন্ত চাইলে সিবিআই ছাড়া গতি নেই। এখন রাজ্য প্রশাসন এই দাবি যে বিশেষ মানবে না, ফলে আনিসের পরিবারের আদালত ছাড়া গতি নেই। ভবিষ্যতে কী হবে, না হবে সেদিকে বঙ্গবাসীর নজর তো থাকবেই, কিন্তু এর মাধ্যমে একটি মারাত্মক সামাজিক প্রবণতাও সামনে আসছে।

এটা ঠিক, আনিস তার ধর্মীয় পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে একদিকে যেমন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতো, তেমনি ইদানীং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক বহু আন্দোলনে জড়িত ছিল যেমন জমি হস্তান্তর বিতর্ক, কলেজের পরিকাঠামো পুনর্বিন্যস্ত করা, স্কলারশিপের টাকা বাড়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে আনিসের সক্রিয় যোগদান ছিল। রাজ্যের বর্তমান শাসকদল যেভাবে বিরোধীশূন্য রাজনীতি করার জন্য, তা সে শিক্ষাঙ্গনেই হোক, কিংবা বৃহত্তম রাজনৈতিক পরিসরে এবং এই কাজে পুলিশ-প্রশাসনকে প্রতিহিংসার কাজে যেভাবে ব্যবহার করছে তাতে সিবিআই তদন্ত না হলে প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে না। বিশেষ করে, যে আমতা থানা এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে সেই হাওড়া (গ্রামীণ)-র পুলিশ সুপার সৌম্য রায় রাজ্যের শাসক দলের এক বিধায়কের স্বামী।

কিন্তু যে প্রবণতার কথা বলছিলাম, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত বাহ্যত দেখা যাচ্ছে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন তাঁর অনুপ্রেরণা-ই হবে হয়তো, এক্ষেত্রে অন্তত যথেষ্ট তৎপর। শাসকদলের একাধিক নেতা এই খুনের ঘটনার নিন্দা করে ও নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট ইত্যাদি করেছেন। এই ঘটনায় রাজ্যের বিরোধী-শিবির যত না উজ্জীবিত ভূমিকা পালন করছেন, শাসক শিবির যেন তার চেয়ে বেশি সুবিচার দিতে মরিয়া। 'উজ্জীবিত', 'সুবিচার' এই জাতীয় শব্দগুলি একটু খটকা লাগতে পারে, কিন্তু রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিটা তেমনই। ফ্ল্যাশব্যাকে চোদ্দ বছর আগের একটা হত্যা দেখে নিন। রিজওয়ানুর হত্যা মামলা। তার আগেও প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু সাফল্য আসেনি। একটা রিজওয়ানুর কাণ্ডই পুরো মুসলিম ভোট তৎকালীন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল, বর্তমান শাসক দলের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এবং সেটাই ছিল কিন্তু তাদের ক্ষমতায় আসার চাবিকাঠি। সেই চাবিকাঠির নিয়ন্ত্রণ এখনও তাদেরই হাতে।

বাঙ্গালি হিন্দু ঘরপোড়া গোরু, তাই সিঁদুরে সামান্য মেঘের আভাস পেলেও ডরাবেই। তবে আমাদের দাবিটা কিন্তু বদলাচ্ছে না— আনিসের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হোক, প্রকৃত তথ্য সামনে আসুক।

রাজ্যের একদা শাসকদল আজ শূন্যে নেমে গেলেও তারা চোদ্দ বছর আগেকার অতীতের ভুল শুধরে নিতে চায়। তাদের বলতে গেলে একদা পৈতৃক সম্পত্তি মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক বেহাত হওয়ার কারণে আজ রাজ্যটাই হাতছাড়া হয়ে গেছে, তারা শূন্যতে এসে ঠেকেছে। ফলে একপক্ষ যেমন কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামছে, অন্যপক্ষ তেমন সুবিচার দিতে মরিয়া। সেদিনের মতো আজও হুবহু একই পরিস্থিতি। সেদিন হৃতশক্তি- বিরোধীদের শক্তি জোগাতে নকশালদের ভরসায় থাকতে হয়েছিল, আজ শূন্য পাওয়া বিরোধী দলকেও আন্দোলনের জন্য নকশালদের মুখাপেক্ষী থাকতে হচ্ছে। এর ফলে একটা হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান সেদিনও হয়েছিল, আজ তো হচ্ছেই। এবং এই শক্তির বলেই দেগঙ্গা, বসিরহাট, উলুবেড়িয়া সারা রাজ্যজুড়ে সেইসময় অর্থাৎ ক্ষমতার পালাবদলের পর্বে হিন্দুদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল। ক্ষমতা দখল ও কায়েমের স্বার্থে মুসলমান-তোষণকে কীভাবে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে সেটা বর্তমান শাসক-দল সেদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল।

আজ সর্বভারতীয় রাজনীতির পরিস্থিতিটা সেদিনের তুলনায় অন্যরকম হলেও সেই ভয়ংকর দিনগুলির মতো বাঙ্গালি হিন্দু নাকে তেল দিয়ে সুনিদ্রা দিলে সমূহ বিপদ। বাঙ্গালি হিন্দু ঘরপোড়া গোরু, তাই সিঁদুরে সামান্য মেঘের আভাস পেলেও ডরাবেই। যাইহোক, আমাদের দাবিটা কিন্তু বদলাচ্ছে না--- আনিসের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হোক, প্রকৃত তথ্য সামনে আসুক।

□

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিধান ঐক্যের পরিপন্থী

ভারতের মুসলমানদেরই ধর্মীয় পোশাক নিয়ে জঙ্গিপনা কেন? আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সন্ত্রাসবাদী ইসলামি গোষ্ঠীগুলো এবং তাদের প্রশ্রয়দাতারা ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের অনুভূতিতে আঘাত করে নিজেদের 'জোর' দেখাতে চাইছে।

বিনয়ভূষণ দাশ

ভারতের সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে আইনের ক্ষেত্রে সমতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'দ্য স্টেট শ্যাল নট ডিনাই টু অ্যানি পার্সন ইকুয়ালিটি বিফোর দ্য ল অর দ্য ইকুয়াল প্রোটেক্টশন অব দ্য ল'স উইদিন দ্য টেরিটরি অব ইন্ডিয়া।' অর্থাৎ সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে কারোর 'সমতা' অস্বীকার করা যায় না; কাউকে বিশেষ অধিকার দিলে এই সমতা রক্ষিত হয় না। কোনো বিদ্যালয়ে কাউকে বিশেষ ধর্মীয় পোশাক পরার অনুমতি দিলে তা অন্যদের প্রতি বৈষম্য বলে গণ্য করা যায়। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, দ্য লেজিসলেশন ক্যান বি হেল্ড আনকনস্টিটিউশনাল ওনলি ইফ ইট ইজ ভায়োলেটিভ অব ইকুয়ালিটি। অর্থাৎ সেই আইনকে তখনই অসাংবিধানিক বলা যাবে যখন সেটা 'সমতা'কে লঙ্ঘন করে। অর্থাৎ একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর আপাতদৃষ্টে যে সমতা বিদ্যমান সেই সমতাকে লঙ্ঘন করে যে নিয়ম বা প্রথা তাকে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দেওয়া যায়। একটা কলেজ বা বিদ্যালয়ে তাদের বিশেষ ইউনিফর্মের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সেই সমতা আনয়ন করা হয়; তাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ আর দৃষ্ট হয় না। আবার সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ফ্রিডম অব কনসায়েন্স অ্যান্ড ফ্রি প্রফেশন, প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রপাগেশন অব রিলিজিয়ন— (১) সাবজেক্ট টু পাবলিক অর্ডার, মরালিটি অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড টু দ্য আদার প্রভিশনস্ অব দিস পার্ট, অল পারসনস্ আর ইকুয়ালি এনটাইটেলড টু ফ্রিডম অব কনসায়নস্ অ্যান্ড দ্য রাইট ফ্রিলি টু প্রফেস, প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রপাগেট রিলিজিয়ন, (২) নাথিং ইন দিস আর্টিকেল শ্যাল অ্যাফেক্ট দ্য অপারেশন অব অ্যানি এগজিসটিং ল অর প্রিভেন্ট দ্য স্টেট ফ্রম মেকিং অ্যানি ল। অর্থাৎ, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সবাইকে তার যুক্তি বা ঔচিত্যবোধ ও মুক্তচিন্তা অনুসারে ধর্ম অনুশীলন এবং প্রচার করার স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে তা যাতে সমাজের শান্তি, নৈতিকতা, সমতা ইত্যাদি রক্ষা করতে সহায়ক হয়। আর এই ধারা কোনোভাবে কোনো প্রচলিত আইনকে ব্যাহত করবে না অথবা রাষ্ট্র বা রাজ্যকে আইনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, সমতা ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করা থেকে বিরত করতে পারবে না। একমাত্র শিখ ধর্মাবলম্বীদের ওই বিধিনিষেধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী।

> **ইসলামি দেশগুলিতে এসব বন্ধ হলে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই, যত আপত্তি শুধু ভারতের বেলায়? কেন? এর পেছনের আসল উদ্দেশ্য কী?**

গত ৫ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক রাজ্য সরকার ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের এডুকেশন অ্যাক্টের ১৩৩(২) ধারা অনুযায়ী সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পোশাকের ব্যাপারে কিছু নির্দেশিকা জারি করে। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হিজাব বা মস্তক আবরণী ইউনিফর্মের অঙ্গ নয় এবং হিজাব পরিধান করা ইসালমি আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রথা নয়। সুতরাং শিক্ষালয়ে হিজাব পরিধান করার অধিকার সংবিধানের 'রক্ষাকবচ' পাওয়ার যোগ্য নয়। ওই নির্দেশিকায় সুপ্রিম কোর্ট এবং অন্যান্য হাই কোর্টের রায় উল্লেখ করে বলা হয়েছে, স্কুল-কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ করা সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা নয়। এখানে স্মর্তব্য যে, ১৯৮৩-র ওই অ্যাক্ট কিন্তু কংগ্রেস আমলেই তৈরি হয়।

সম্প্রতি সংবিধানের এই ১৪ ও ২৫ নং অনুচ্ছেদ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কর্ণাটক উডুপীর এম জি এম কলেজের এক ছাত্রী হঠাৎই হিজাব পরিধান করে শ্রেণীকক্ষে ঢোকার চেষ্টা করে। এটা নাকি তাঁর ধর্মীয় অধিকার। যদিও বেশিরভাগ মুসলমান ছাত্রীই কলেজের নির্দেশিকা মেনে হিজাব ছাড়াই ক্লাসে যোগদান করেন। সচরাচর যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হলো। ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়ে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

তারা কয়েকজন ছাত্রীকে হিজাব পরে ক্লাসে ঢুকতে উসকাতে থাকে, আর এতেই শুরু হয়ে যায় বাদবিতণ্ডা। মুসকান নামে যে ছাত্রীটি কলেজের ড্রেস কোড ভাঙতে এগিয়ে আসে ধর্মের দোহাই দিয়ে, সে কিন্তু জীবনের অন্যান্য সময় আধুনিক পোশাকেই চলাফেরা করে। আর মুসকানের এই ঘটনার পরেই গোটা কর্ণাটক জুড়ে শুরু হয়ে যায় দেশকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নেবার এক পরিকল্পিত অভিযান। হিজাব পরিধানকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি। হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের ছবি ও প্ল্যাকার্ড ছড়িয়ে দেওয়া হয় গোটা কর্ণাটক রাজ্যে। তাতে লেখা হয়— ' আমি হিজাব ভালোবাসি', 'হিজাব আমাদের অধিকার', ' হিজাব আমাদের গর্ব', হিজাব আমার পছন্দ, আমার জীবন' ইত্যাদি। পড়াশোনার বিষয়টি পেছনে চলে যায়। মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার আহ্বান প্রাধান্য পায়। এমনকী রামমোহন, বিদ্যাসাগরের শহর কলকাতার যাদবপুর, প্রেসিডেন্সির ফাটাপ্যান্ট পরা ছাত্র-ছাত্রীরাও মধ্যযুগে ফিরে যাবার এই অভিযানে শামিল হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গড় হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলার সুতীর বহুতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কয়েকজন ছাত্রীকে হিজাব পরে বিদ্যালয়ে আসতে নিষেধ করায় একদল মারমুখী যুবক ও অভিভাবক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে হেনস্থা করে এবং তাঁকে অন্যায়ভাবে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। আর জন্য রাজ্য সরকার এক ন্যক্কারজনক কাজ করে বসে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী দীনবন্ধু মিত্রকে নবদ্বীপে বদলি করা হয়। শিক্ষালয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' অর্থাৎ বিদ্যা হলো তাই যা বিদ্যার্থীদের মুক্তমনা করে তোলে, অথচ সেই শিক্ষাঙ্গনে মুক্তমনা করার বদলে ধর্মীয় পোশাকের নাম করে ভিন্নতা সৃষ্টিতে মদত দিচ্ছে কোনও কোনও গোষ্ঠী। যেখানে একটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত সংহতি, একতা ও সমতা গড়ে তোলা, সেখানে ধর্মীয় পরিচয়কে উসকে দিয়ে, পৃথক পরিচয়কে উসকে দিয়ে বিচ্ছিন্নবাদের বীজ বপন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একটি গোষ্ঠী। অথচ তাদের মনে রাখা উচিত, ' নো ফ্রিডম ইজ অ্যাবসোলুট অ্যান্ড এভরি ফ্রিডম ইনক্লুডিং দ্য ফ্রিডম অব রিলিজিয়ন ইজ সাবজেক্ট টু রেজনেবল্ রেসট্রিক্টশনস্।' মানুষের নানা পরিচয় থাকে। কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছে যদি অন্য পরিচয় বাদ দিয়ে কেবল ধর্মীয় পরিচয় বড়ো হয়ে ওঠে তাহলে একটি রাষ্ট্রের মূল কাঠামোকেই কুঠারাঘাত করা হয়, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। কর্ণাটক বা কলকাতার হিজাব বিতর্ক এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাকেই সামনে নিয়ে এসেছে। কর্ণাটক হাই কোর্ট রায় দিয়েছে, 'রেসট্রেইনিং স্টুডেন্টস্ অব কলেজেস দ্যাট হ্যাভ অ্যা প্রেসক্রাইবড্ ড্রেস কোড অর ইফনিফর্ম ফ্রম উইয়ারিং রিলিজিয়াস গারমেন্টস্ টিল ফারদার অর্ডারস্, অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড দ্য স্টেট টু রিওপেন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস।' এদিকে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বাল বিষয়টিকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গিয়েছিলেন মুসলমান ছাত্রীদের ওই দাবির পক্ষে। অথচ এইসব নেতা ও আন্দোলনকারী ছাত্রী এবং তাদের সমর্থকরা ভুলে যাচ্ছে যে, সরকারি বিদ্যালয় বা কলেজ কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়; এখানে ধর্মীয় পোশাক পরিধান করার অনুমতি দেওয়া মানে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টিতে মদত দেওয়া। শিক্ষাদান ছাড়াও সামাজিক সংহতি ও ঐক্যবোধ গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়াটাও শিক্ষালয়ের কাজ। সংবিধানে ১৪ ও ২৫ অনুচ্ছেদ ধর্মীয় অধিকার স্বীকার করলেও ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার পক্ষে মত দিয়েছে এবং সরকারকে এবিষয়ে প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের অধিকারও দিয়েছে। সরকারের প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষমতাও সংবিধান দিয়েছে। কিন্তু তবু ধর্মীয় অধিকারের প্রশ্ন তুলে হিজাব পরার পক্ষে একটা বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীকে উসকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কর্ণাটক রাজ্যে এই বিশেষ গোষ্ঠীটি বিশেষভাবে সক্রিয়। এবং পশ্চিমবঙ্গেও। এর আগে কর্ণাটকে টিপু সুলতানের জন্মদিনকে কেন্দ্র করেও এই ধরনের গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেছে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। আবার এখন হিজাবকে কেন্দ্র করে যে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে তার পেছনেও আছে সেই কংগ্রেস। এক্ষেত্রেও যথারীতি দোসর বামপন্থীরা। উল্লেখ্য যে, দেশের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিন্তু তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধি অনুযায়ীই পোশাক স্থির করা হয়। দেশের ইসলামি ও খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর বহু ইসলামি দেশ হিজাব, নিকাব বোরখা পরিধানের ওপর নানান নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। চীনের কথা নাই-বা উল্লেখ করা গেল। ইসলামি দেশ আজারবাইজান, টিউনিসিয়া, কভসো, মরক্কো, লেবানন, মিশর,সিরিয়া ইত্যাদি দেশ তাদের ছাত্রীদের হিজাব ও বোরখা পরা নিসিদ্ধ করেছে অথবা নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কিন্তু এদেশের হিজাবপন্থী ও বোরখাবাদীরা কখনো প্রতিবাদ করেছে বলে শোনা যায়নি। ইসলামি দেশগুলিতে এসব বন্ধ হলে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের কোনো আপত্তি নেই, যত আপত্তি শুধু ভারতের বেলায়? কেন? এর পেছনের উদ্দেশ্য কী? আবার দেশের নিরাপত্তার ওপর আঘাত আসতে পারে বলে পশ্চিমি দেশ যেমন রাশিয়া, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ বোরখা, হিজাব ইত্যাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ভারতের মুসলমানদেরই ধর্মীয় পোশাক নিয়ে জঙ্গিপনা কেন? আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সন্ত্রাসবাদী ইসলামি গোষ্ঠীগুলো এবং তাদের প্রশ্রয়দাতারা ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের অনুভূতিতে আঘাত করে নিজেদের 'জোর' দেখাতে চাইছে। শুধু হিসেবেই এই প্রক্রিয়া থেমে থাকবে না, বরং হিজাব ও বোরখা দিয়ে তারা ওই প্রক্রিয়াটি চালু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দারুল দেওবন্দের খোয়াব অনুযায়ী এই দেশকে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করার এক-একটা পদক্ষেপ এগুলি। একমাত্র সচেতন ও সংগঠিত হিন্দু সমাজই পারে এই বিপদকে প্রতিহত করতে।

রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র
একটি ঐতিহাসিক পত্র

নেতাজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা স্মরণ করা আবশ্যক। দুজনেই একই পথের যাত্রী ছিলেন। নেতাজী সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যিই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাক্ষত্রিয়।

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। এদের সম্পর্কে অনেক তথ্য ব্রিটিশ আমলে গোয়েন্দা বিভাগে সংরক্ষিত হতো। অন্যান্য বিপ্লবীদের সম্পর্কে আলাদা আলাদা গোপন ফাইল থাকতো। বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র গোয়েন্দারা বাজেয়াপ্ত করতো। এমনই এক মূল্যবান নথি হলো ১৯৩৮ সালে জাপান থেকে রাসবিহারী বসুর লেখা সুভাষচন্দ্র বসুকে এক ঐতিহাসিক পত্র— যা সুভাষচন্দ্রের কাছে পৌঁছয়নি। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হন। সুভাষচন্দ্রকে রাসবিহারী এক দীর্ঘপত্র লিখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার অভিমুখ ব্যাখ্যা করেন। আসলে রাসবিহারী ছিলেন এক অনমনীয় বিপ্লবী। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বিপ্লববাদী সংগ্রামকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫) প্রথম জীবনে বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপকে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত করতে উদ্যোগী

হন। উত্তর ভারতে ও পঞ্জাবে তাঁর প্রচেষ্টায় বিপ্লববাদী তৎপরতা প্রসারিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনিই ভারতীয় সেনানীদের নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় ছদ্মবেশে ভারত থেকে জাপানে চলে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য জাপানের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি সুভাষের হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব তুলে দেন। এরপর সুভাষচন্দ্র নেতা থেকে নেতাজীতে পরিণত হলেন।

রাসবিহারী বসু প্রথম থেকেই সশস্ত্র বিপ্লববাদের সংগঠক ও নেতা ছিলেন, অপরপক্ষে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, তবে তাঁর সঙ্গে বাঙ্গলার বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এরপর তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর রাসবিহারী জাপান থেকে ২০ জানুয়ারি তাঁকে একটি বড়ো চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে রাসবিহারী জানালেন যে জাতীয় কংগ্রেস এখন আপোশমুখী এবং আন্দোলন বিমুখ রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তাই

জাতীয় কংগ্রেসকে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

কংগ্রেসের সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তাই ছিটেফোঁটা ওষুধে কাজ হবে না। When the whole body is poisoned, applying medicine on certain parts will be of no use। এছাড়া অহিংসার বুজরুকি দূর করা প্রয়োজন। তাই অহিংস ও সহিংস দুই পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এখন প্রয়োজন হলো অবিলম্বে সামরিক প্রস্তুতি। রাসবিহারী আরও জানালেন যে ভারতে হিন্দু সংহতি জোরদার করতে হবে।

এই সময় আরও প্রয়োজন হলো

এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ঐক্যবোধ। একমাত্র জাপান এই বিষয়ে তৎপর হয়েছে। জাপানের একমাত্র লক্ষ্য হলো এশিয়া থেকে ব্রিটিশ শাসন বিধ্বস্ত করা। তাই ভারতের নিজস্বার্থে জাপানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা প্রয়োজন।

চিঠির শেষে তিনি সুভাষচন্দ্রকে আপোশহীন সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে সাফল্য আসবেই। রাসবিহারীর মতে 'Lead the nation along the right path and success will be yours and India's)। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী কার্যকলাপ রাসবিহারীর প্রদর্শিত পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রথমে তিনি কংগ্রেসকে সক্রিয় আন্দোলনমুখী করার জন্য গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শামিল হলেন। এইজন্য তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হলো। তিনি আপোশ বিরোধী সম্মেলন ডাকলেন। অচিরে গৃহবন্দি হলেন। দেশের ভেতরে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তিনি রহস্যজনকভাবে দেশত্যাগ করলেন।

প্রথমে জার্মানিতে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার শুরু করলেন। তারপর তিনি পাড়ি দিলেন এশিয়ায়। জাপানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় উপস্থিত হলেন। রাসবিহারী তাঁর হাতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন। এর পরের কথা সবারই জানা। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। এরপর যুদ্ধাভিযান। ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে দেশের মধ্যে আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রবেশ করল। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না।

নেতাজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে রাসবিহারী ও সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা স্মরণ করা আবশ্যক। দুজনেই একই পথের যাত্রী ছিলেন। নেতাজী সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যিই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাক্ষত্রিয়।

।। সংযোজন।।

স্বস্তিকার অমৃত মহোৎসব সংখ্যা, কিছু কথা :

স্বস্তিকার স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসব সংখ্যা পড়ে ভালো লাগল। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গলার প্রান্তিক অঞ্চলের ভূমিকা নিয়ে স্বস্তিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক হয়েছে। তবে তথ্য ও সাল তারিখের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভ্রান্তি দেখতে পেলাম। পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভস-এর অধিকর্তা হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানীদের বিষয়ে অজস্র গোপন নথিপত্র দেখেছি। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে গোপন নথিপত্রের সংকলন প্রকাশ করেছিলাম। গ্রন্থটির নাম Midnapur's Tryst with struggle (২০০৪ খ্রিস্টাব্দ)। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে যে লেখা প্রকাশ করেছেন তাতে বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ল। মেদিনীপুরের প্রথম শ্রমিকদের সংগ্রামের উল্লেখ নেই।

ক্ষুদিরাম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা থাকলেও মেদিনীপুরের বিপ্লববাদের পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে আলোচনা নেই। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুসারী ছিলেন। দেশপ্রাণ শাসমলের নেতৃত্বে খাজনা বন্ধ আন্দোলন আলোচিত হয়নি। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শীর্ষনেতা সতীশচন্দ্র সামন্তের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়নি। তিনি তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন। অন্যান্য লেখাগুলির মধ্যে ঢাকার ক্ষেত্রে যে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়নি সেগুলি হলো ঢাকায় বিপ্লববাদের প্রসারে মূল সংগঠক ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান কর্ণধার পুলিনবিহারী দাস। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতি বিপ্লবী আন্দোলনের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ১৯২০-র দশকে ঢাকায় লীলা রায় (নাগ) মহিলাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চার করেন, তাঁর উদ্যোগে দিপালী সঙ্ঘ ও শ্রীসঙ্ঘ গঠিত হয়। পৃষ্ঠা ৩৮-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের আলোচনায় দুটি তথ্যের তারিখ ভুল দেখানো হয়েছে। প্রথম লাইনে বলা হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৮১ সালের ১১ নভেম্বর। হবে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর। আর বলা হয়েছে ১৯১১ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাদ সমাবেশ হয়। সঠিক তারিখ ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভস-এর অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা ও ইতিহাসবিদ)

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

সিঙ্গুরে ভেড়িশিল্প এবং মাছেভাতে বাঙ্গালি

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সিঙ্গুরে টাটাদের তৈরি হওয়া গাড়িশিল্প ফেলে রেখে টাটা কোম্পানিকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিলেন রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনিচ্ছুক কৃষকদের পক্ষ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গুর আন্দোলন বাঙ্গলার রাজনীতিতে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে সেই জমি কৃষকদের ফেরত দিলেও কৃষকরা চাষ করতে পারেননি। এবার সেই জমিতে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে মাছের ভেড়ি। যদিও কিছুদিন আগে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী টাটাদের এরাজ্যে এসে শিল্পগড়ার বিনীত প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন— 'টাটাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ ছিল না, বিরোধ ছিল তৎকালীন রাজ্য সরকারের সঙ্গে।' মন্ত্রীর সেই আহ্বানে টাটা কোম্পানি মুচকি হেসে সেই প্রস্তাবকে 'টা-টা' জানিয়েছে।

সরকারের মাছের ভেড়ি প্রকল্পের ঘোষণার পর বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ভেড়ি আমাদের ভিত্তি, মাছ আমাদের ভবিষ্যৎ।' বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ টুইটে লিখেছেন— 'সিঙ্গুরে কৃষকদের তিন ফসলি জমির পরিবর্তে এক টুকরো কাগজ আর ইট-কংক্রিটের জায়গা ফেরত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেখানে এখন শুধুই কাশফুল জন্মায়। চাষের জমিতে ভেড়ি, আর প্রকৃত ভেড়ি লুট। যে মানুষগুলো তাঁকে ভরসা করেছিলেন, তাদের আর কত বোকা বানাবেন দিদিমণি?'

রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে কাটমানি প্রকল্পের বাড়বাড়ন্ত, সেই রাজ্যে গরিব কৃষকদের ভেড়ির উপর যদি সরকারি দলের দেশপ্রাণ কর্মীবৃন্দের সাহায্যের হাত প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাকে তাহলে ভেড়ি মালিকরা কতটা লাভের মুখ দেখবে তা অবশ্য সময়ই বলবে।

শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'সিঙ্গুরে কৃষকরা জমি ফেরত পেলেন, ফসল পেলেন না। মুখ্যমন্ত্রী সরষের বীজ ছড়ালেন, কৃষকরা চোখে সরষেফুল দেখলেন। এখন সেখানে মেছো ভেড়ি হচ্ছে। শুধু সিঙ্গুরেই নয়, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে কৃষিযোগ্য জমিতে ভেড়ি তৈরি করা হচ্ছে। এ যেন ভেড়ি আমাদের ভিত্তি, মাছ আমাদের ভবিষ্যৎ।

বেকারত্বের রাজ্যে কোনো শিল্পই ফেলনা নয়। সে ভেড়ি শিল্পই হোক বা ভেড়ার পশম শিল্পই হোক। চাই শুধু পরিকল্পনাকে সুষ্ঠভাবে রূপায়ণ করা। পুরনো ভেড়িগুলোতে তো মাঝে মধ্যেই মারদাঙ্গা, ভেড়ির মাছ লুট, ভেড়ির মালিক হত্যার খবর সংবাদমাধ্যমের দৌলতে জানা যায়। সিঙ্গুরে ভেড়ি তৈরি হলে সেখানেও যে কাটমানিখোরদের এবং এলাকার দুষ্ট ছেলেরা নতুন ভেড়ি মালিকদের কী দুরবস্থা করে ছাড়বে তা ভবিষ্যতই বলবে। তবে ভেড়িতে যে ফসল উৎপাদিত হবে তার নাম মাছ। এই মাছ সম্পর্কে কিছু পৌরাণিক

ও ঐতিহাসিক তথ্য জেনে নেওয়া যাক—

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকে প্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় অনুশাসন এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের ব্যাপক প্রচারের প্রতাপে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মানুষ দ্রুত নিরামিশাষী হয়ে উঠতে থাকে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া বাঙ্গালিদের মধ্যে কিন্তু ওই প্রচার তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ অসংখ্য নদ-নদী-খাল-বিল-দিঘিতে পূর্ণ বঙ্গদেশের সর্বত্র অনায়াসে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত বলে বরাবর এখানকার সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে মাছ-ভাতই ছিল প্রধান খাদ্য। উপরন্তু স্মৃতিকার দেখিয়েছিলেন যে, কয়েকটা বিশেষ পর্ব-দিন ছাড়া অন্যান্য দিন মাছ-মাংস খাওয়া মোটেই গর্হিত কাজ নয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে রোহিত, সফর (পুঁটি), সকুল (শোল) এবং শ্বেতকট ও আঁশযুক্ত মাছ ব্রাহ্মণ খেতে পারে। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ তেল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়ে জীমূতবাহন ইল্লিশ (ইলিশ) মাছের তেলের উল্লেখ করেছেন। এতে মনে হয়, প্রাচীনকালেও ইলিশ বাঙ্গালির প্রিয় খাদ্য ছিল। তবে যেসব মাছ গর্তে বা কাদায় থাকে, যাদের মুখ ও মাথা সাপের মতো— দেখতে কদাকার, যাদের আঁশ নেই, সেইসব মাছ ব্রাহ্মণদের খাওয়া নিষেধ ছিল।

উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে মাছ খাওয়ার ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ থাকলেও নিম্নবর্ণের ও জনজাতি মানুষের মধ্যে কোনও বাছবিচার ছিল না। প্রাচীন যুগের বাঙ্গালির মৎস্যপ্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে দেখা যায়। মাছ কোটা, ঝুড়িতে ভরে মাছ হাটে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কিছু চিত্র ফলকে উৎকীর্ণ আছে।

ভগবান বিষ্ণু সর্বপ্রথম মৎস্যাবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে বোধহয় মাছ আমাদের কাছে মঙ্গলদায়ক। তাই ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানে মাছ অপরিহার্য। বিবাহ উপলক্ষ্যে গায়ে হলুদের তত্ত্বের সঙ্গে একটা গোটা রুই আলতা-সিঁদুর মাখিয়ে পাঠাতে হয়। বধূবরণকালে নববধূর হাতে একটা ল্যাটামাছ দেওয়ার প্রথা অনেক জায়গায় আছে। বঙ্গের অনেক স্থানে মেয়েদের ও ছেলেদের আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর সময় রুইমাছের আস্ত একটা মুড়ো বেঁধে পাতে দিতে হয়। শ্রাদ্ধের পরের দিন ব্রাহ্মণকে মাছ খাইয়ে মৎস্যমুখ করা বিধেয়। প্রাচীনবঙ্গে শনির দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পোড়া মাছ খাওয়ার প্রথা ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে মাছ-মাংস তো উপাসনার অঙ্গ। তাছাড়া আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিটি 'মীন'। মানুষের করতলে ও পদতলে মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন থাকা নাকি সৌভাগ্যের লক্ষণ।

মহাকাব্যে, পুরাণে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে মৎস্য সম্পর্কিত অনেক কাহিনি আছে। মহাভারত রচয়িতার জন্মবৃত্তান্ত আমাদের জানা। চেদিরাজ উপরিচরের বীর্য ঘটনাক্রমে যমুনার জলে পড়ে। সেই জলে শাপভ্রষ্ট স্বর্গ-বিদ্যাধরী অদ্রিকা মৎস্যরূপে বাস করছিল। পতিত বীর্য ভক্ষণ করে অদ্রিকা গর্ভবতী হয় এবং পরে ধীবরের জালে ধরা পড়ে ডাঙায় এসে যমজ পুত্র-কন্যা প্রসব করে শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে যায়। মৎস্য সন্তান দেখে আনন্দিত চেদিরাজ নিজে পুত্র সন্তান গ্রহণ করে ধীবরকে কন্যা সন্তান দান করেন। কালক্রমে যৌবনবতী মৎস্যকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে পরাশর মুনি তার সঙ্গে মিলিত হন, ফলে ব্যাসদেবের জন্ম হয়।

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন স্বয়ংবর সভায় মৎস্যচক্ষু ভেদ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। অর্জুন আবার মৎস্য-নরপতি বিরাটের মৎস্যকন্যা উত্তরার সঙ্গে নিজপুত্র অভিমন্যুর বিয়ে দিয়েছিলেন। শনির কোপে রাজ্যহারা রাজা শ্রীবৎস রানি চিন্তাদেবীকে নিয়ে বনে অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন। একদিন জেলেরা মাছ না পেয়ে বিষণ্ণ মনে ফিরে যাচ্ছিল। রাজার অনুরোধে আবার জাল ফেলে তারা অনেক মাছ ধরে এবং খুশি হয়ে রাজাকে একটা বড়ো শকুল (সোল) মাছ দেয়। চিন্তাদেবী সেই মাছটা পুড়িয়ে সরোবরের জলে ধুতে গেলে শনির কারসাজিতে পোড়ামাছ জ্যান্ত হয়ে জলে পালিয়ে যায়। মৎস্য অবতারের কাহিনি নিয়েই তো মৎস্যপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে আছে, জলাশয়ে একটা মাছকে পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে বাস করতে দেখে সৌভরি ঋষির মনে সংসারী হওয়ার বাসনা জাগে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' তো একটা মাছের জন্য বিয়োগান্ত থেকে মিলনান্ত নাটকে পরিণতি লাভ করেছে। মাছের পেট থেকে স্মারক চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয়টি না পাওয়া গেলে রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পুনর্মিলন সম্ভব হতো না। এছাড়া মাছ নিয়ে আরও অনেক কাহিনি আছে।

সমাজপতিরা একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে ইলিশ, ভেটকি, মাগুর ও রুই এই উৎকৃষ্ট মাছগুলিকে নিরামিষ আখ্যা দিয়ে তাদের সকল বাঙ্গালির রন্ধনশালায় প্রবেশাধিকার দিয়ে দেন। তবে এই অদ্ভুত আচরণের আসল উদ্দেশ্য যাতে ধর্মভীরু অশিক্ষিত মানুষের কাছে ধরা না পড়ে তার জন্য শিরোমণিরা ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কোন কোন তিথি বার এবং পূজা-পার্বণে মাছ খেতে নেই এবং ব্রাহ্মণের কোন কোন আঁশযুক্ত মাছ খাওয়াতে দোষ হয় না তা সবিস্তারে লিখে গেছেন। কিন্তু কালক্রমে তিথি বার এবং অন্যান্য বিধান অগ্রাহ্য করে, অল্প কিছু পরিবার ছাড়া, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ সকলের ঘরে সব মাছ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে থাকায় সমাজপতিরা প্রমাদ গুনলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে শুধু বিধবাদের জন্য নিরামিষ আহারের বিধান জারি করে নিজেদের মুখ রাখার সহজ পথ খুঁজে নিলেন।

মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালির মধ্যে গৌড়ের রাজা বল্লাল সেনের জুড়ি মেলা ভার। কোনোদিন মাছছাড়া রাজার রাজভোগ হতো না। একবার এক ভবিষ্যদ্‌বক্তা মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে রাজার মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা ব্যক্ত করাতে রাজার আদেশে পদ্মানদী থেকে রোজ কাঁটা বিহীন মাছ আনার জন্য এক রাতের মধ্যে চল্লিশ হাজার ভাড়াটিয়া প্রজা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় ত্রিশ মাইল দীর্ঘ একটা রাস্তাই নাকি বানিয়ে ফেলেছিলেন। এহেন মৎস্যকুলের বৃদ্ধির জন্য সরকার যদি ভেড়ি শিল্পের উন্নতি তড়িৎ গতিতে করতে পারে তাতে দোষের কিছু নেই বরং অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু যে রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে কাটমানি নামক প্রকল্পের বাড়বাড়ন্ত, সেই রাজ্যে গরিব কৃষকদের ভেড়ির উপর যদি সরকারি দলের দেশপ্রাণ কর্মীবৃন্দের সাহায্যের হাত প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাকে তাহলে ভেড়ি মালিকরা কতটা লাভের মুখ দেখবে তা অবশ্য সময়ই বলবে।

কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাস

বেদ মোহন ঘোষ

কোথায় গেল কলকাতার সেই মনমাতানো পেশাদারি থিয়েটারগুলি। বৃহস্পতি, শনি, রবি আর ছুটির দিনের বিকেলবেলা গম্‌গম্‌ করত থিয়েটার হলগুলি। কোথায় গেল থিয়েটার হলগুলির সামনে টিকিট কাটার লম্বা লাইন আর উৎসাহী মানুষের ভিড় তাদের প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের এক ঝলক দেখার জন্য? গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, শিশির ভাদুড়ী, মহেন্দ্র গুপ্ত এরা তো কিংবদন্তী মানুষ সেই পুরনো থিয়েটারের যুগে। কিন্তু এরপর থিয়েটারে এলেন সিনেমা জগতের জনপ্রিয় নায়ক নায়িকার দল। কে না ছিলেন সেই দলে। উত্তম, সাবিত্রী, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সৌমিত্র, অপর্ণা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, বসন্ত চৌধুরী, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, অনুপকুমার প্রমুখ। 'হাউস ফুল' ফলক ঝুলত থিয়েটার হলগুলির সামনে। খবরের কাগজে পাতা জুড়ে থাকত থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও ছবি। শুধু কলকাতা নয়, দর্শক ভিড় করে আসত সারা বাঙ্গলা থেকে। বিদেশিদের আকর্ষণও কম ছিল না। কিন্তু কোথায় গেল সেই স্বর্ণময় দিনগুলি? কলকাতার পেশাদারি থিয়েটার আজ এক ইতিহাসে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা থিয়েটারের পুরনো ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে। যেদিন রুশ নাগরিক লিয়েবেদেফ্‌ কলকাতার ২৫নং ডোমতলায় (অধুনা এজরা স্ট্রিট) জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়িতে প্রথম কলকাতার স্থানীয় মানুষদের জন্য একটি নাটক মঞ্চস্থ করলেন। লিয়েবেদেফ্‌ বাড়িটি ৩০০ আসনবিশিষ্ট একটি নাট্যগৃহে রূপান্তরিত করে নাম দিলেন 'বেঙ্গলি থিয়েটার'। লিয়েবেদেফ্‌ পেশায় ছিলেন পেশাদার সংগীত ও বাদ্যশিল্পী। তিনি রাশিয়া থেকে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা আসেন ১৭৮৭ সালে। সেই সময় 'ক্যালকাটা থিয়েটার' নামে একটি মাত্র থিয়েটার ইংরেজদের জন্য কিছু নাটক মঞ্চস্থ করত। লিয়েবেদেফের প্রথম নাটকটি 'দ্য ডিসগাইজ' গল্পের অনুবাদের নাট্যরূপ। একটি মাত্র অঙ্ক অভিনীত হয় প্রথম দিন। দ্বিতীয় রজনীতে অভিনয় হয় সম্পূর্ণ নাটকটি তিন অঙ্কে এবং নাটকের অংশ বিশেষের সংলাপ ছিল ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা ভাষায়। কিন্তু কিছু ইংরেজের প্ররোচনায় ইংরেজ গভর্নমেন্ট তাঁকে রুশ গুপ্তচর রূপে চিহ্নিত করার ফলে তিনি ১৭৯৭ সালে প্রাণভয়ে স্বদেশ ফিরে যান এবং তারপরেই বন্ধ হয় 'বেঙ্গলি থিয়েটার'। সেই হিসেবে ২০০ বছরের ইতিহাসে কলকাতা থিয়েটারের জনকের গৌরব অর্জন করেছেন লিয়েবেদেফ্‌।

এরপর প্রায় আটত্রিশ বছর পরে ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবর শুরু হয় নবীন বসুর থিয়েটার। ধনাঢ্য নবীন বসু প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িটি নাট্যশালায় পরিবর্তিত করেন। এখন যেটি ট্রামডিপো। কৃত্রিম ঝড়-বৃষ্টির জন্য বহুমূল্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে। নাটকের স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য বারাঙ্গনাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বিশাল ব্যয়বাহুল্যের জন্য বন্ধ হয়ে গেল সেই থিয়েটার। এরপর প্রায় ৩৭ বছর কলকাতার মানুষ কোনো পেশাদারি নাট্যমঞ্চে অভিনয় দেখার সুযোগ পাননি। পাইকপাড়ার রাজাদের দুই ভাই প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রিন্স দ্বারকানাথের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িটি নাট্যশালায় রূপান্তরিত করে মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাট্যরূপে মঞ্চস্থ করেন ১৮৫৮ সালে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে এই নাট্যশালাও বন্ধ হয়ে যায় ১৮৬১ সালে।

বলা যায়, কলকাতার থিয়েটারের পেশাদারি অভিনয়ের ধারাবাহিকতা

অক্ষুণ্ণ রেখে নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বরের পর থেকে যেদিন 'ন্যাশানাল থিয়েটার' নাম দিয়ে দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পণ' নাটকটির অভিনয় শুরু হয় জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে। পরবর্তীকালে ১৮৭৩ সালে বিডন স্ট্রিটে এই নাট্যগোষ্ঠী 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচিত হয়। এই মঞ্চেই বিনোদিনী প্রথম 'সখী' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু কিছু নাটকের বিষয়বস্তুর কারণে রাজরোষ, পুলিশি হামলা ও মামলা মোকদ্দমায় উঠে যায় এই থিয়েটার। এই ১৮৭৩ সালেই বিডন স্ট্রিটে বর্তমানে যেখানে পোস্ট অফিস আছে সেখানেই ধনকুবের শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন 'বেঙ্গল থিয়েটার'। কলকাতার প্রথম পেশাদারি নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল মাটির দেওয়ালে আর খোলার চালে। একটানা প্রায় কুড়ি বছর এই নাট্যগোষ্ঠী এখানে বিভিন্ন নাটকের সফল অভিনয় করে। মধুসূদনের পরামর্শে চারজন বারাঙ্গনা জগত্তারিণী, এলোকেশী, শ্যামা ও গোপালকে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করার জন্য নিয়োগ করায় এই নাট্য গোষ্ঠীর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বন্ধ হয়ে যায় এই থিয়েটার।

বিডন স্ট্রিটের ঐতিহ্যশালী 'মিনার্ভা' স্থাপন করেন প্রসন্ন ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ সালে। বিভিন্ন সময় হাতবদলের পর ১৯৪৯ সালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ' প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেন উৎপল দত্ত। রঙ্গালয়টি এখন কলকাতা পৌরসভার অধীনে এবং মাঝে মাঝে গ্রুপ থিয়েটার অভিনয়ের সুযোগ পায়। 'বিশ্বরূপা' থিয়েটারের যাত্রা শুরু ১৯৫১ সালের ৭ জুন 'আরোগ্য নিকেতন' নাটকের মাধ্যমে। জনপ্রিয় প্রযোজনা ক্ষুধা, সেতু, চৌরঙ্গী প্রভৃতি। এখন প্রোমোটারের কবলে পড়ে বহুতল বাড়িতে পরিবর্তিত। 'রঙমহল' নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে ১৯৩১ সালে ৮ আগস্ট শিশির কুমারের 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকের মাধ্যমে। কলকাতার প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ এখানেই সংযোজিত হয়েছিল। বর্তমানে কাপড়ের বাজার। উত্তর কলকাতায় অমর ঘোষের অন্যতম আধুনিক 'সারকারিনা' মঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত

হয় ১৯৭৬ সালের ২২ জুলাই। বৃত্তাকার মঞ্চটিকে উঠানো-নামানো ও ঘোরানো যায়। অমর ঘোষের মৃত্যুর পর মঞ্চটি বন্ধ। উত্তর কলকাতার অন্য একটি মঞ্চ 'রঙ্গনা'। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিন পয়সার পালা', 'শের আফগান' প্রভৃতি নাটক প্রভূত সমাদৃত হয়েছিল। এখন বন্ধ।

১৮৮৩ সালে ৬৮, বিডন স্ট্রিটে ধনী ব্যবসায়ী গুর্মুক রায়ের স্টার থিয়েটারের পত্তন থেকে কলকাতা থিয়েটারের শুরু হলো এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে ধন্য হয়েছিল এই নাট্যশালা আর এখানেই নটী বিনোদিনীর মহান আত্মত্যাগ ও অসামান্য অভিনয় এক কিংবদন্তী ঘটনা। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বিলুপ্ত করে দিয়েছে সেই আদি স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চকে। ১৮৮৭ সালে পুনরায় স্বমহিমায় নির্মিত হলো ঐতিহাসিক স্টার থিয়েটার কর্নওয়ালিশ ও গ্রে স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে। অত্যাধুনিক স্টার থিয়েটারে সংযোজিত হলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, আধুনিক শব্দ ও আলোক সম্পাতের প্রক্রিয়া ও ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। একটানা ৪৮৪ রজনী অভিনীত হয়ে 'শ্যামলী' নাটক কলকাতা থিয়েটারে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। কিন্তু এক আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল স্টার থিয়েটার ১৯৯১ সালের ১২ অক্টোবর। সরকারি অধিগ্রহণের পর ঐতিহাসিক স্টার থিয়েটারকে সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে বটে কিন্তু সেখানে কোনো অভিনয় হয় না— সিনেমা প্রদর্শনীর জন্য সংরক্ষিত।

এখন বিশিষ্ট কয়েকটি থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক।

এছাড়া এক সময়কার জনপ্রিয় নাট্যমঞ্চগুলি যেমন হাজরা মোড়ে সুজাতা সদন, কালীঘাটে তপন থিয়েটার, কালিকা, উত্তর কলকাতায় কাশী বিশ্বনাথ, বয়েজ ওন হল, বিজন থিয়েটার, প্রতাপ মঞ্চ, রামমোহন মঞ্চ ইত্যাদি সব পেশাদারি মঞ্চের আলোগুলি একে একে নিভে গেছে। টিম্ টিম্ করে জেগে আছে শুধুমাত্র কিছু গ্রুপ থিয়েটার ও সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী। মূলত ১৯৯৫ সাল থেকে কলকাতার থিয়েটারের অবনমন শুরু। এখন নাটকের অভিনয় দেখতে দর্শকের ভিড় হয় না। তারপর মারাত্মক ভাবে বেড়েছে বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক খরচ। আর আছে বিভিন্ন সরকারি করের বিশাল বোঝা।

বর্তমান প্রজন্মের মানুষ তো জানেই না এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের অব্যক্ত ইতিহাসের কথা। তবুও থিয়েটার-প্রেমী কলকাতার মানুষ আশা রাখে, সরকার ও নাট্যপ্রাণ মানুষের প্রচেষ্টায় আবার শুরু হবে ঘুম কেড়ে নেওয়া কালজয়ী নাটকের অভিনয়। □

হিজাব বিতর্ক : বৃহত্তর বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রেরই অংশ

দাবিটা হিজাব পরবার স্বাধীনতা নিয়ে কখনোও নয়, দাবিটা বিদ্যালয়ের স্কুল ইউনিফর্মকে অস্বীকার করে শ্রেণীকক্ষে হিজাব পরবার। খবরটা যদিও এভাবেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এক শ্রেণীর ধান্দাবাজ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বিভেদকামী মিডিয়ার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ঘুলিয়ে দেওয়া প্রচারে বিষয়টিকে হিজাব পড়বার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লঙ্ঘন রূপে দেখানো হচ্ছে। দেশ বিদেশের টুকরে টুকরে গ্যাং আবার সক্রিয় হয়েছে। আরবান নকশালরা কলম নিয়ে যথারীতি নাকিকান্না শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান সেদেশের ভারতীয় রাজদূতকে ডেকে কৈফিয়ত চেয়েছে। মালালার বক্তব্য, ভারতে মুসলমান মহিলারা সংখ্যাগুরুদের দ্বারা আক্রান্ত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত।

বাস্তবে হিজাব নিয়ে এই দেশে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। যে কেউ পরতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে হিজাবের বিরোধিতা কেউ কখনও করেনি। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব ড্রেসকোড রয়েছে, সেখানে এই ধরনের বিপজ্জনক দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ জিন্নার ভাবনাকেই পুনরায় পরিপুষ্ট করা। আজ হিজাব, বোরখা নিয়ে হচ্ছে, কাল 'নামাজি টোপি' নিয়ে হবে, পরশু হয়তো আলাদা ক্লাসরুম, তারপর আলাদা কলেজ। মিড ডে মিলে হালাল খাদ্য বহু বিদ্যালয়ে চালু হয়ে গিয়েছে। এ তো গেল স্কুল কলেজের কথা। এর পর পুলিশ-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীতেও একই দাবি উঠবে। সাদা চোখে এগুলোকে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হলেও বাস্তবে এগুলো প্যান ইসলামিজমেরই অংশ। এর পেছনে নিশ্চিত ভাবেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে, শুধু জল মেপে দেখা হচ্ছে মাত্র। আসল লক্ষ্য আলাদা দেশ, শরিয়তি দেশ... 'দার-উল-ইসলাম'। তাই এই বিষাক্ত বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দরকার। শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসন দিয়ে এই কাজ সম্ভব নয়। প্রয়োজন, ব্যাপক জনজাগরণের। কর্ণাটকের ছাত্র-ছাত্রীদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে তারা এই অন্যায় দাবির বিপক্ষে গর্জে উঠেছে। গর্জে উঠেছে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক সমাজও। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির অভাব কোনওকালেই ছিল না এই দেশে। তাই আগের মতো ন্যক্কারজনক ভূমিকায় সেই বামপন্থীরা। ধর্মকে আফিম জ্ঞান করা, সোভিয়েত রাশিয়ার উচ্ছিষ্টভোজী কমিউনিস্টরা একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আজ বোরখা, হিজাবের সমর্থনে চিলচিৎকার করছে। এই বামপন্থীরা আবার হিজাবের সঙ্গে অকারণ ঘোমটা টেনে এনে ওকালতির চাতুরিতায় বিষয়টিকে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ধান্দামূলক বস্তাবাদ বোধহয় একেই বলে! প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বক্তব্য তো আরও লজ্জাজনক। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ, যে কেউ বিকিনি পরেও ক্লাসে আসতে পারে। সঙ্গে জুটেছে পেট্রোডলার পুষ্ট ব্রেকিং ইন্ডিয়া গ্রুপ, তৎসহ এক শ্রেণীর মিডিয়া, যারা চায় সদাসর্বদা অস্থির থাকুক এইদেশ। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক ভারত। একটি হিজাবি মহিলার নাটুকেপনাকে মহান প্রতিপন্ন করে যেভাবে আরবান নকশালরা উঠে পড়ে অপপ্রচার শুরু করেছে, তাতে বিশ্বের দরবারে হেয় হলো ভারতবর্ষ। তবে আশার কথা এই যে জাতীয়তাবাদী নাগরিকরাও বসে নেই, বিশেষ করে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যারা অডিয়ো, ভিসুয়াল, সোশ্যাল, ফিজিক্যাল সবদিক দিয়েই যেভাবে পালটা সংযত আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এই শক্তিই তো আজ চাই। চাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণ সমাজ। তবেই তো গড়ে উঠবে আধুনিক ঐক্যবদ্ধ ভারত, নিশ্চিহ্ন হবে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'। নির্মিত হবে বৈভবশালী দেশ।

—মন্দার গোস্বামী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

গত বিধান সভা নির্বাচনের ভিত্তিতে চার পৌর নিগমের ভোট

বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৪টের মধ্যে ২ নিগমে (ওয়ার্ড ভিত্তিতে) নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল। বিজেপি বিধানসভায় ২০০ সিটের টার্গেট রেখে ছিল। এটা কোনো অন্যায় নয়। ২০০-র মধ্যে ৭৭টা আসন পেয়েছিল। ভোটও ভালো পেয়েছে। রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। সাধারণ মানুষের যেটা অসুবিধা হয়েছিল, তাহলো যারা ঘাসফুলের পতাকা নিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করেছিল তারাই রাতারাতি বিজেপির প্রার্থী, নেতা হয়ে গেল। তখনই সাধারণ মানুষের বড়ো একটা অংশ বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তাই ২০০ না হয়ে হলো ৭৭। আর কেউ বুঝুক না বুঝুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো করেই এই সত্যটা বুঝতে পারেন। তাই টিএমসি আর দেরি করেনি। বিজেপি সংগঠন গুছিয়ে নেবার আগেই শুরু হয় আক্রমণ। যে নেতারা মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আশাহত হয়ে তারা আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়াননি। দল হিসেবে বিজেপি এখনো তার খেসারত দিয়ে চলেছে। আত্মনির্ভর ভারত যেমন প্রয়োজন, তেমনি দলে আত্মনির্ভর নেতৃত্ব একান্ত আবশ্যক।

—শ্যামল হাতি,
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯।

জন্মনিয়ন্ত্রণ বিলের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি রাজ্যসভায় পেশ হয়েছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিল। এই বিলটি এনে কেন্দ্রের দাবি, দেশে কমছে হিন্দু জনসংখ্যা, বাড়ছে মুসলমান। ১৯৫০ সালের লোকগণনা অনুযায়ী দেশে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৯ শতাংশ। বর্তমানে সেটা বেড়ে হয়েছে ১৪ শতাংশ অথচ হিন্দু জনসংখ্যা ৮২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭৯ শতাংশ। কেন্দ্রের এই সময়োচিত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য রাজ্যসভার সদস্য রাকেশ সিনহাকে দেশের মানুষ অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই জন্মনিয়ন্ত্রণ বিলটি কার্যকরী করার। অসম সরকার বেশ কয়েকবছর আগেই এই

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিল বা দু' সন্তান নীতি সাহসের সঙ্গে প্রয়োগ করেছে, যে হারে এদেশের জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে জনসংখ্যায় পৃথিবীতে প্রথম চীনের সমকক্ষ হতে ভারতের আর মাত্র দু-এক বছর লাগবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, জনবিস্ফোরণের এই মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করতে এতবছর পরেও সরকার কোনো সুনির্দিষ্ট জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি! অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে কোনো সরকারের পক্ষেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। অন্যদিকে, হিন্দুদের চাইতে মুসলমান জন্মহার যে বেশি, সেকথা আমরা সবাই জানি কিন্তু মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা দেখাতে গিয়ে সব রাজনৈতিক দলই জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে ভয় পায়। শরিয়ত আইনের দোহাই দিয়ে এই লকডাউনে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দুই দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ বিদ্যালয়ে নাবালিকা ছাত্রীদের ব্যাপক হারে বিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে প্রশাসন কত অসহায়! ভোট ব্যাঙ্ক হারানোর আশঙ্কায় রাজ্য সরকার সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে থেকেছে। এভাবেই অল্প বয়সে নাবালিকা ছাত্রীদের বিয়ে, তারপর অকালে সন্তান ধারণ। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই জন্মনিয়ন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করে এক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হু-হু করে বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গেলেই চোখে পড়বে, একদিকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাড়বাড়ন্ত অন্যদিকে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের উপচে পড়া ভিড়।

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে মাদ্রাসা ও মসজিদের মৌলবিদের মাইক মারফত নির্দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণকে কাঁচকলা দেখিয়ে ব্যাপক হারে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। এভাবে তো জনগণ জনসম্পদ হয়ে উঠতে পারে না! গরিব পরিবারে ৪-৫টি সন্তান থাকলে সেখানে যেমন লেখাপড়া শিখতে পারবে না তেমনি যথার্থ মানুষ তৈরি হওয়ার পরিবেশও পাবে না। ফলে জনগণ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের চাকায় পিষ্ট হয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে এবং দেশের বোঝা হয়ে জেলখানায় বন্দিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। এইসব জেলার জেলখানাগুলোতে ৮০ শতাংশ বন্দি মুসলমান সম্প্রদায়ের। চোরাকারবারি, বেআইনি অস্ত্র ব্যবসা, জালনোট ও জঙ্গি কার্যকলাপ আজ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ফুলে ফেঁপে উঠছে এবং তারজন্য এক শ্রেণীর মানুষের অনিয়ন্ত্রিত জন্মহারই দায়ী বলে এক বেসরকারি সমীক্ষায় ধরা পড়েছে।

অতএব সরকারি গেজেটে পরিসংখ্যান তুলে ধরে হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার যে শতাংশ দেখানো হয়েছে বাস্তবে সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। অবিলম্বে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে ও রাজ্যসভায় জন্মনিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করিয়ে রাজ্য সরকারগুলোকে তা কার্যকরী করতে না বলে তাহলে দেশ ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন এক সম্প্রদায়কে খুশি করতে সিএএ-এর বিরোধিতা করেছে তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ বিলেরও বিরোধিতা করবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই মুসলমান জন্মহার সবচেয়ে বেশি। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখানে কোনো সম্প্রদায়কে ছোটো না করে দেশের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন, আসুন, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করিয়ে দুই সন্তান নীতি গ্রহণ করি যাতে আগামী প্রজন্ম সুখ ও শান্তিতে থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই দেখবেন, সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে যদি এই জনকল্যাণমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ বিলটির বিরোধিতা হয় তাহলে ৩৭০ ধারা কিংবা সিএএ-এর মতো বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদের দুই কক্ষেই যাতে এই বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত করা হয়। তা নাহলে বর্তমানে যেমন ১০০টির উপরে বিধানসভার সিট মুসলমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আগামীদিনে তাঁর সংখ্যা বেড়ে আত্মবিস্মৃত হিন্দুদের বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে।

—তরুণ কুমার পণ্ডিত,
কাঞ্চন তার, মালদা।

বিচ্ছিন্নতাবাদী তত্ত্ব

বামপন্থী চিন্তাধারা হলো, ভারতই চীন আক্রমণ করেছে, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, আর ভারত হলো কয়েকটি জাতিসত্তার সমষ্টি, যাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার হলো এক ধরনের স্বাধীনতা। এই জাতিতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক প্রবক্তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিসকে গ্রহণ করেন। এ বছরে এই থিসিস আশি বছরে পড়লো। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদ উস্কে দিতে রাজাজী ফর্মূলাও কম দায়ী নয়। আশি বছর আগে, ডাঃ অধিকারী, 'পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য' নামে যে তত্ত্বের অবতারণা করেন, তা লোকদেখানো স্বাধীনতা ও সাম্যের গান গাইলেও প্রকৃত অর্থে এ হলো, দেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে, খণ্ডবিখণ্ড করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা। ওই থিসিসের ছত্রে ছত্রে আছে— স্বাধীন ভারতের নবজাত স্বয়ংশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে মুসলমান বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী এক বা একাধিক রাজ্য যদি তার বা তাদের জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তবে তার বা তাদের এই বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

স্বাধীন ভারতীয় সঙ্ঘ (ইউনিয়ন) অথবা ফেডারেশনের মধ্যে স্বয়ংশাসিত দেশ হিসেবে থাকবার অধিকার থাকলে এই সঙ্ঘ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকারও এদের থাকবে। এর অর্থ এই যে, এইরূপ জাতিসমূহের বাসভূমি যেসব অঞ্চল, তথাকথিত দেশীয় রাজ্যও ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক নির্ধারিত করে অঞ্চলবাসী জাতিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সুতরাং আগামীদিনের ভারত হবে পাঠান, পশ্চিমাপাঞ্জাবি (মুখ্যত মুসলমান), শিখ, সিন্ধি, হিন্দুস্থানি রাজস্থানি, গুজরাটি, বাঙ্গালি, অসমীয়, বিহারি, ওড়িয়া, অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাটকি, মারাঠা, কেরল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির স্বয়ংশাসিত দেশসমূহের এক ফেডারেশন অথবা সঙ্ঘ। এ যেন এক বিচ্ছিন্নতাবাদের স্বীকৃত দলিল। এবছর এই থিসিস আশি বছরে পদার্পণ করল। বামপন্থীদের নির্বাক হয়ে যাওয়া বা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূল্যায়নে ভুল ছিল— সেইরূপ ব্যাখ্যা না করে ভাবতে হবে, বামপন্থীদের কাছে ভারতবর্ষ এখনও মাতৃভূমি নয়।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

রাইনৃত্য সংরক্ষণে জ্ঞানেশ্বরী নাইডু

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের দেশ পারম্পরিক নৃত্যকলাতে অতি সমৃদ্ধ। তবে, নানান কারণে লুপ্তপ্রায় হতে বসেছিল বেশ কিছু নৃত্যশৈলী, যার পুনরুজ্জীবনে মহিলাদের আন্তরিক অবদানকে আমরা বারংবার প্রণাম জানাই। এইরকম একটি নৃত্যশৈলী হলো বুন্দেলখণ্ডের পারম্পরিক ও একসময় লোকপ্রিয় লোকনৃত্য 'রাই'। এই নৃত্যকলাটি সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। গরবা নাচ যেমন গুজরাটের বিখ্যাত নৃত্যশৈলী, তেমনই একসময় বুন্দেলখণ্ডের প্রসিদ্ধি ছিল রাইনৃত্যকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই লোকনৃত্যটির জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। কোনো একসময় রাইনৃত্য সারাবছর মানুষের মনোরঞ্জন করত। নিজস্ব শৈলী, নিজস্ব সংগীত এবং নিজস্ব তাল। রাইয়ের গান কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। মৃদঙ্গের তালে-তালে ঘুঙুরের রিনিঝিনির সঙ্গে নৃত্যরতা 'স্বাংগ' গ্রামবাসী-শহরবাসী-আপামর জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

বর্তমানে অনেক অল্পবয়েসি শিল্পী এই নৃত্যশৈলীটি ভালোবেসে এর চর্চা করে চলেছেন; এঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন মধ্যপ্রদেশের যুবা নৃত্যাঙ্গনা জ্ঞানেশ্বরী নাইডু। জ্ঞানেশ্বরীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই নৃত্যশৈলী পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে। দেশ-বিদেশে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে বুন্দেলখণ্ডের রাইনৃত্য পরিবেশন করে আসছে 'বেড়নী'রা। বেড়িয়া জনজাতির মহিলাদের বলা হয় 'বেড়নী'। সাধারণ পরিবারের মহিলারা সাধারণত এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করতেন না। ধীরে ধীরে তথাকথিত আধুনিকতা সমাজে প্রবেশ করে এবং এই নাচ সামাজিক স্বীকৃতিভুক্ত হতে থাকে, এর সঙ্গে বেড়িয়া জনজাতিদের দুর্দশাও রাইনাচের প্রচার প্রসারের ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়।

এটি সংরক্ষণ করার জন্য বুন্দেলখণ্ডের পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। ছত্রপুর জেলার বসারীতে প্রায় গত ৩০০ বছর ধরে বুন্দেলী উৎসব আয়োজন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রাইনৃত্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া দমোহ জেলার হট্টা'তে আয়োজিত বুন্দেলী মেলাতে প্রায় গত চোদ্দ বছর ধরে মঞ্চে রাইনৃত্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

বেড়িয়া জনজাতির মহিলাদের মতে, অতীতে রাইনৃত্যাঙ্গনাদের সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না, কিন্তু বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। রাইনৃত্য সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং রাইনৃত্যাঙ্গনারা সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন।

নতুন প্রজন্মের রাইনৃত্যাঙ্গনা জ্ঞানেশ্বরী নাইডু জানিয়েছেন, তিনি নিজে 'বেড়নী' নন, কিন্তু এই লোকনৃত্যকে ভালোবেসে আত্মস্থ করেছেন। এখন তিনি সমাজে ছোটো শিশুদের এই বিশেষ নৃত্যশৈলীর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষকে এই নৃত্যশৈলীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

হট্টাতে আয়োজিত হওয়া বুন্দেলী মেলার সূত্রধর পুষ্পেন্দ্র হাজারীর মতে ১৪ বছর ধরে হট্টাতে বুন্দেলী মেলার আয়োজন করা হয়। এতে বর্তমানে সবথেকে জনপ্রিয় হলো রাইনৃত্য। বেড়নীয়াদের নৃত্যকলাকে যখন সমাজ যথার্থ স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছে, তখন নতুন করে এই নৃত্যকলায় প্রাণ ফিরে এসেছে। বর্তমানে নতুন প্রতিভাধরদের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত। এই নৃত্যকলা প্রচারিত-প্রসারিত হচ্ছে। দর্শক এই নৃত্যের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন। এই প্রচেষ্টার অগ্রদূত হলেন মাতৃশক্তি! □

পেপটিক আলসার ও হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

'পেপটিক আলসার' কী? কেন হয়? পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, আলসার মানে ক্ষত বা ঘা। লোয়ার ইসোফেগাস, স্টম্যাক বা ডিওডেনামের ক্ষতকেই চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় 'পেপটিক আলসার'। পেপটিক আলসার বিভিন্ন কারণে হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

(ক) হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি : এটি একটি ব্যাকটিরিয়া, যা আমাদের স্টম্যাক বা পাকস্থলীর অ্যাসিড সিক্রিয়েশন বাড়িয়ে দেয়। শতকরা ৯০ ভাগ 'পেপটিক আলসার' এবং ৭০ ভাগ 'গ্যাস্ট্রিক আলসার' এই ব্যাকটিরিয়ার জন্যই হয়ে থাকে। পাকস্থলীর গাত্রে অবস্থিত শ্লেষ্মাস্তর বা গ্যাস্ট্রিক মিউকাসের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে এই সমস্যা তৈরি করে থাকে।

(খ) হেরিডিটি বা বংশগত : পেপটিক আলসারের বংশগত যদি ইতিহাস থাকে, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এটা বেশি লক্ষ্য করা যায় ডিওডেনাম এর ক্ষেত্রে।

(গ) ধূমপান : ধূমপানের ফলে পাকস্থলীতে এইচ.সি.এল-এর ক্ষরণ বেশি হয়, অনেক ক্ষেত্রে ডিওডেনাম আলসারও তৈরি করে থাকে।

(ঘ) নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইফ্লোমেটরি ওষুধ : এই জাতীয় ঔষধ বেশি খেলে স্টম্যাকের এইচ.সি.এল ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। ফলে স্টম্যাকে অ্যাসিডের ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

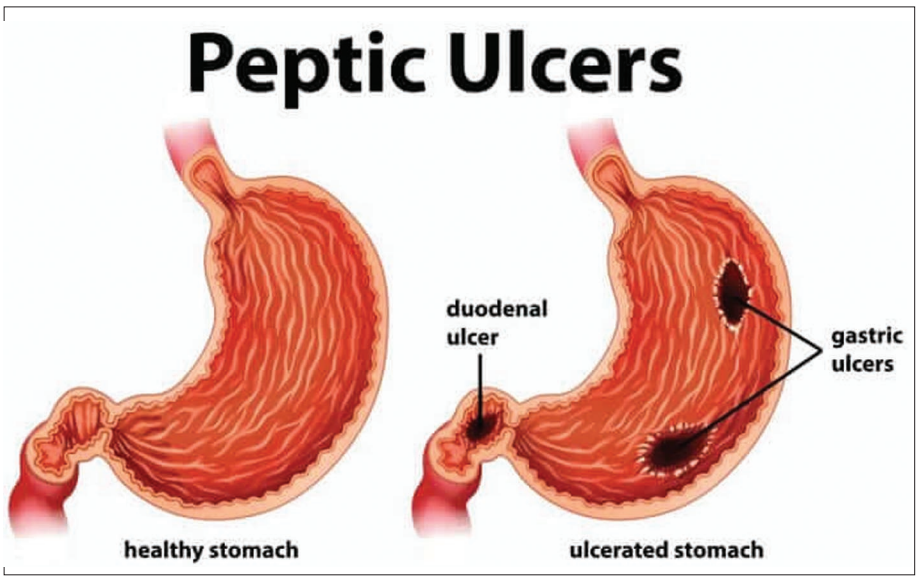

লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ :

১. খিদের সময় পেটে জ্বালা। চিকিৎসা পরিভাষায় একে হাঙ্গার পেইনও বলা যায়। খিদে পেলেই পেটে জ্বালা করে, আবার কিছু খেয়ে নিলেই পেটের জ্বালা কমে যায়।

২. পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে মূল লক্ষণই হচ্ছে পেটে ব্যথা। তবে পেট ব্যথা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়, রোগী হাতের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ব্যথার নির্দিষ্ট জায়গা। ব্যথা প্রধানত এপিগ্যাসট্রিয়ামের জায়গায় হয়ে থাকে।

৩. রাত্রে পেটে ব্যথা। কিছু কিছু সময় রাত্রে ঘুমের মধ্যে অসহ্য পেটের ব্যথায় ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু খাবার, দুধ অথবা হজমের ওষুধ খাওয়ালে ব্যথাটা কমে যায়। এটিই পেপটিক আলসারের লক্ষণ।

৪. এপিসোডিক পেট ব্যথা। এই ধরনের পেট ব্যথা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর হয়ে থাকে। যেমন কোনও সময়ে যদি সপ্তাহে ২ দিন ব্যথা থাকে, তো পরের মাসে ঠিক ওই সময়েই ব্যথা হয়ে থাকে। এই ভাবে বছরে ৩-৪ বার ব্যথা হলে তবেই এপিমোডিক পেট ব্যথা বলা হয়।

কী থেকে হয় এবং কী থেকে রক্ষা পাবেন?

১. পেপটিক আলসার একপ্রকার বংশগত অসুখ। ছোটো বয়স থেকে সজাগ থাকা উচিত।

২. অতিরিক্ত ঝাল খাবার খেলে এবং অত্যধিক মদ্যপান ও ধূমপানেও আলসার হয়। এসব থেকে দূরে থাকা উচিত।

৩. দীর্ঘক্ষণ খালিপেটে থাকলে আলসার হতে পারে।

৪. বেশিমাত্রায় স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খেলে।

অন্যান্য লক্ষণ : মুখ দিয়ে জল ওঠা, বমি, খিদে নষ্ট হয়ে যাওয়া, বুক জ্বালা করা ইত্যাদি উপসর্গ থেকে পেরিটোনথিটিস দেখা দিতে পারে। ফলে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ডায়াগনোসিস : পেপটিক আলসারের উপসর্গগুলো দেখে নিশ্চিত হওয়ার আগে অবশ্যই প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। যেমন—

(ক) ডাবল কনট্রাস্ট বেরিয়াম মিল পরীক্ষা।

(খ) এন্ডোস্কোপি। পেপটিক আলসারের সঙ্গে অন্যান্য কিছু রোগের লক্ষণ থাকলেও তা পেপটিক আলসার নয়। তা হতে পারে অ্যাকশন্যাল বা ডিসপেপিসয়া বা ক্যারোনোমা।

হোমিও চিকিৎসা : হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হলো লক্ষণগত চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগীর ধাতুগত চিকিৎসা করলে আশাতীত সাফল্য পাওয়া যায়। বহু ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে। তবে, কখনই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়ানো উচিত নয়। কারণ, একজন চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি ও মাত্রা প্রয়োগ করে থাকেন। □

দিব্য কাশী ভব্য কাশী

অনামিকা দে

ত্রিলোকেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব অধিষ্ঠিত কাশী বিশ্বনাথ ধাম ভারত তথা বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের পুণ্য তীর্থস্থান। এটি শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট বলে মনে করা হয়। কথিত, কাশীধামে দেহত্যাগ করলে মানুষের মুক্তিলাভ হয়। অষ্টাদশ শতকে ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাই হোলকার কাশী বিশ্বনাথধাম সংস্কার করেন। প্রায় ২৫০ বছর পর বর্তমান ভারত সরকার নরেন্দ্র মোদী কাশীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছেন। নতুন রূপে সুসজ্জিত করা হচ্ছে কাশীকে।

আগের মন্দিরটির চত্বর এখন ৫ লক্ষ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত। এই কমপ্লেক্সে একসঙ্গে ২ লক্ষ ভক্ত জমায়েত হতে পারবে। মজার বিষয় হলো, জ্ঞানব্যাপী মসজিদ পরিচালন কমিটি বিশ্বনাথ ধামের উন্নয়নের জন্য ১৭০০০ বর্গফুট জমি ছেড়ে দিয়েছে এবং বিনিময়ে প্রধান সড়কে ১০০০ বর্গফুট প্লট পেয়েছে। প্রসঙ্গত, ঔরঙ্গজেব মন্দির ভেঙে তার ওপর এই মসজিদটি তৈরি করেছিল। ১৯৯১ সাল থেকে এই বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত আর্কিওলিজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে (এএসআই) সত্য জানতে একটি সমীক্ষা চালাতে বলেছে। মামলাটি এখনও এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারাধীন।

দিব্য কাশী ভব্য কাশী প্রজেক্টের প্রধান অংশ হলো কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে গঙ্গাঘাট করিডোর। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প যা বারাণসী তীর্থক্ষেত্রে একটি বড়ো পরিবর্তন আনতে চলেছে। এই প্রকল্পটি বিশ্বনাথ মন্দিরকে গঙ্গার ঘাট থেকে সরাসরি তীর্থযাত্রীদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলবে। ৩৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটি ২০২৩-এ সম্পূর্ণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ৫৬ মিটার চওড়া করিডোরের দৈর্ঘ্য হবে ৩০০ মিটারের বেশি। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো তীর্থযাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধা দেওয়া।

- প্রকল্পের অংশ হিসাবে মোট ২৪টি ভবন নির্মাণ করা হবে।
- একটি আনুমানিক ৫০ ফুট করিডোর সরাসরি গঙ্গার মণিকর্ণিকা এবং ললিতা ঘাটকে বিশ্বনাথ মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।
- করিডোরে তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য ওয়েটিংরুম থাকবে।
- বারাণসীর প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে চিত্রিত করা মিউজিয়াম ও অডিটোরিয়াম সেখানে থাকবে।
- ভক্তরা যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিশেষ যজ্ঞশালা পাবেন।
- পুরোহিত, স্বেচ্ছাসেবক ও তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ বাসস্থান থাকবে।
- করিডোরে একটি অনুসন্ধান কেন্দ্র থাকবে যা পর্যটকদের শহর ও অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থান সম্পর্কে অবহিত করতে পারে।
- পর্যটকদের কথা ভেবে বেনারসি ও অন্যান্য চটকদার খাবার পরিবেশনের জন্য থাকছে ফুড স্ট্রিট।
- সমাবেশ, সভা ও মন্দিরের কার্যাবলীর জন্য একটি অডিটোরিয়াম থাকছে।
- থাকছে গঙ্গা ভিউ গ্যালারি, যাতে পর্যটকরা গঙ্গার পরিষ্কার দৃশ্য দেখতে পান।

২০২১-এর ১৩ ডিসেম্বর একটি যুগান্তকারী দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ধাম প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে টুইট করে দেশবাসীকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ওইদিন প্রকল্পের প্রথম পর্বের মোট ২৩টি ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রায় ৩০০০ হাজারেরও বেশি দর্শনার্থী ১৩ ডিসেম্বর এই উদ্বোধনের সাক্ষী থেকেছেন।

উত্তরপ্রদেশ সরকার কাশীর তীর্থক্ষেত্রকে একটি সুগঠিত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সম্পূর্ণ প্রয়াস করছে। কাশীর উন্নয়নের পাশাপাশি জেলা চান্দাউলি, গাজীপুর, মউ, জৌনপুর, ভাদোহী ও মির্জাপুরে কর্মসংস্থানের উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। পর্যটন ও বিভিন্ন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে আগামীদিনে। বারাণসী ভবিষ্যৎ উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে।

কাশী করিডোরে নরেন্দ্র মোদী।

জ্যোতির্ময় কাশী আজ জগতের দীপ্তি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বার্ধক্যের বারাণসী :

বঙ্গজীবনে শিব-পার্বতী যেন ঘরের মেয়ে-জামাই। এছাড়া আরও বহু দেব-দেবীর অর্চনা করলেও ভোলা মহেশ্বর আর উমা যেভাবে সকলের জীবনে জায়গা করে নিয়েছেন তার কোনো নজির পাওয়া যায় না কোথাও। বাঙ্গালির নামকরণে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার সম্ভবত শিব বা দুর্গার। বঙ্গদেশে এমন একটিও গ্রাম পাওয়া যাবে না যেখানে নেই কোনো শিব মন্দির অথবা মায়ের থান। তাই হিন্দু বাঙ্গালি অন্তিমে শুনতে চায় তারকব্রহ্ম নাম। সেই নাম স্মরণ করে শরীর ত্যাগের বাসনা প্রায় প্রত্যেকের। এ কারণে বিগত ঊনবিংশ তো বটেই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও সুখে-দুঃখে, স্বেচ্ছায় অথবা বিড়ম্বনায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ব্যক্ত করে কাশীবাসের ইচ্ছা। মৃত্যু কামনা করেন কাশীতেই, কেননা বিশ্বাস তাতেই হবে মোক্ষ লাভ। শেষ সময়ে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কানে শোনাবেন তারকব্রহ্ম নাম। আর তাতেই হবে মুক্তি।

বঙ্গদেশে শিবতীর্থ হিসেবে তারকেশ্বর, বক্রেশ্বর, জল্পেশ্বর এবং চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই অনাদি অতীতে থেকেই বঙ্গবাসীর টান কাশী বিশ্বনাথের প্রতি। শুধু বঙ্গবাসী নয়, ভারতের প্রতিটি প্রদেশের মানুষের কাছেই 'বার্ধক্যের বারাণসী' ওই শিবতীর্থ। কেবল তীর্থ নয়, প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যও এমন ভাবে আর কোথাও সজীব নয়। ধর্ম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, নানা কলা শিল্পের অনুশীলন ভারতে কোথাও এমনভাবে প্রবাহিত হয়নি যুগ থেকে যুগান্তরের পথে।

আধ্যাত্মিক রাজধানী :

কিংবদন্তি স্বয়ং মহেশ্বর তাঁর ত্রিশূলের অগ্রভাগে স্থাপন করেছিলেন দেবভূমি কাশীকে। বলা হয়, কাশী স্থাপনের কাল খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। ঐতিহাসিকরা অবশ্য বহু গবেষণা শেষে বলেন, কাশীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তিনহাজার বছর আগে। সময়ের এই সূক্ষ্ম বিচারে না গিয়েও বলা যায়, উপনিষদ- পুরাণ-মহাকাব্যে যেভাবে কাশীর কথা এসেছে বারেবারে, তাতে স্পষ্ট, কাশী হলো ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

কেবল আধ্যাত্মিক সাধনা নয়, কাশীর সারস্বত সাধকদের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত সকলের সব সাধনাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই যুগে যুগে ধর্মাচার্যরা কাশীতেই এসেছেন তাঁদের উপলব্ধির কথা প্রকাশের জন্য। আর সেই কারণেই বোধি লাভের পর তথাগত বুদ্ধ তাঁর প্রথম উপদেশ দানের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন কাশী থেকে মাত্র মাইল ছয়েক দূরের সারনাথকে। অষ্টম শতকে আদি শঙ্করাচার্য, একাদশ শতকে রামানুজাচার্য থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য অথবা তুলসীদাস, রামানন্দ, কবীর কিংবা সাম্প্রতিককালে বামাক্ষ্যাপা, রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধক এসেছেন কাশীতে গঙ্গায় পুণ্য অবগাহনে, বিশ্বেশ্বর দর্শনে, শাস্ত্রপ্রচারে এবং কাশীর বুধমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনায় ঋদ্ধ হতে বা সকলকে সমৃদ্ধ করতে। শুধু হিন্দু নয়, জৈনরাও কাশীকেই মানেন অন্যতম তীর্থস্থান হিসেবে। সেকারণেই অসংখ্য হিন্দু মন্দিরের পাশাপাশি কাশীতে আছে বহু জৈন মন্দিরও। ২৩তম জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথেরও আবির্ভাব ভূমি এই কাশীই। কাশীর বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ জগতের ঈশ্বর। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথমটিই হলেন বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে আছে শিবভূমি কাশীর নানা শিবস্থানের বিবরণ। কাশী বিশ্বনাথের আবির্ভাব সম্পর্কে রয়েছে যেসব পৌরাণিক কথা, তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়েছে এক পরম সত্যের অপূর্ব মাহাত্ম্য। সত্যই যে জীবনের পরম সম্পদ, সত্যই যে ঈশ্বর, সত্যই

যে শিব— সতত শুভ, সে কথাই ঘোষিত হয়েছে বারেবারে নানা শাস্ত্রগ্রন্থে।

আদি জ্যোতির্লিঙ্গ :

শিব পুরাণের কাহিনি, একবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণু জড়িয়ে পড়েন এক বিবাদে। বিবাদ হলো— কে বড়ো তাঁদের মধ্যে। ব্রহ্মা বলেন, তিনি সৃষ্টি করেন। তাই তিনিই শ্রেষ্ঠ। অস্বীকার করেন বিষ্ণু। অবশেষে বিবাদ মীমাংসার জন্য শরণ নেন তাঁরা সংহারকর্তা শিবের। শিব সেসময় ত্রিভুবন ভেদ করে আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময় এক অনন্ত স্তম্ভ রূপে। তারপর বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে বলেন, এই স্তম্ভের আদি ও অন্তের সন্ধান করো তোমরা। যে পৌঁছতে পারবে উৎসে, জেনো সেই শ্রেষ্ঠ জন।

শুরু হয় যাত্রা। ব্রহ্মা যান ওপর দিকে আর বিষ্ণু বরাহরূপে যান পাতাল পথে উৎস সন্ধানে। কেটে যায় অনন্তকাল। ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু কেউ-ই খুঁজে পান না সেই জ্যোতিস্তম্ভের আদি অথবা অন্ত। বিফল হয়ে ফিরে আসেন তাঁরা। ব্রহ্মা কিন্তু নিলেন অসত্যের পথ। স্তম্ভের মাথা থেকে ঝরে পড়া একটি কেতকী ফুলকে সাক্ষী রেখে বলেন, তিনি পৌঁছেছিলেন জ্যোতির্স্তম্ভের শীর্ষে। সেখান থেকে এনেছেন এই কেতকী পুষ্প।

ব্রহ্মার সেই মিথ্যা ভাষণে শিব ক্রুদ্ধ হন কিন্তু ভেতরেই চেপে রাখেন সব রাগ। শান্ত কণ্ঠেই বলেন বিষ্ণুকে— তুমি-তুমি কি পৌঁছতে পেরেছো উৎস মূলে?

অকপট বিষ্ণু কেঁদে ফেলেন। বলেন, না। আমি খুঁজে পাইনি ওই জোতির্লিঙ্গের উৎস। আমি ভুল। মিথ্যে আমার অহংকার। ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ।

বিষ্ণুর কথা শুনে উল্লসিত ব্রহ্মা। পঞ্চমমুখে বলেন, বলেছিলাম না। দেখলে তো শ্রেষ্ঠ কে?

এবার গর্জে উঠেন রুদ্র— সে এক ভয়ংকর রূপে। না, মিথ্যে বলছ তুমি। অন্তে পৌঁছতে পারনি তুমি?

মহাদেবের সেই ক্রোধ থেকে জন্ম নেয় এক ভৈরব। শিব বলেন, যে পঞ্চম মুখটি দিয়ে মিথ্যে বলেছে ব্রহ্মা— ছিঁড়ে ফেল সেই পঞ্চম মুণ্ডটি। আর শোনো ব্রহ্মা— আজ থেকে এই ভূ-চরাচরে কোথাও হবে না তোমার পূজা। আর সত্য ভাষণের জন্য সৃষ্টির অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত পূজিত হবেন বিষ্ণু। বলেন, অখণ্ড অনন্ত সত্যের প্রতীক এই জ্যোতির্লিঙ্গে অবস্থান করবেন তিনি নিজে।

ধ্বংস বারে বারে

কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস হয়েছে একাধিকবার। কখনো পুরাকালে, কখনো ঐতিহাসিক যুগে। পুরাকথা— তখন চলছে রাজা দিবোদাসের রাজত্ব। কুম্ভক নামে এক মুনি ঘুরতে ঘুরতে এক সন্ধ্যায় পৌঁছলেন কাশীতে। তাঁর নিয়ম ছিল, যেখানে সন্ধ্যা হবে সেখানেই তিনি থেকে যাবেন হাজার বছর। তাই কাশীবাসী হলেন মুনি কুম্ভক। রাজ্যে তখন চলছিল আকাল। অথচ আশ্চর্য, মুনির আশ্রম সবুজে সবুজ। নানা শস্যে পরিপূর্ণ। তাই রাখালরা সেখানেই আসে গোরু চরাতে। একদিন নিজেদের গোরুর সঙ্গে আশ্রমের গোরুটিও নিয়ে যায় তারা। জানতে পেরে ক্রুদ্ধ কুম্ভক অভিশাপ দেন ধ্বংস হবে কাশী। হলোও তাই, তিনি চলে যাওয়ার পর।

হরিবংশের কাহিনি— বিয়ের পর মহাদেব আর পার্বতী থেকে যান সেখানেই। মেতে থাকেন রভসে-আনন্দে দিনরাত। মন নেই তাঁদের অন্যকাজে। ফলে নষ্ট হয় প্রকৃতির ভারসাম্য। সবকিছু যায় থমকে। আতঙ্কিত দেবতারা যান পার্বতী-জননী মেনকার কাছে। শিবকে সবকিছু বোঝানোর জন্য অনুরোধ করেন।

জামাই নয়, মেয়ে পার্বতীকেই ভর্ৎসনা করেন মেনকা। বেশ রূঢ়ভাবেই। অভিমানে ঘর ছাড়েন পার্বতী। সঙ্গে শিবও। তবে শিবালয় কৈলাশে না গিয়ে তাঁরা আসেন কাশীতে।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর— এই তিন যুগ এখানে বাস করেও পার্বতীর ভালো লাগে না

বাবা ভিড় থেকে মুক্ত হলেন

ব্রহ্মচারী হৃষিকেশ মহারাজ
শিবশক্তি সেবাধাম, কাশী

কাশী করিডোর হওয়ার কারণে বাবা বিশ্বনাথ অযৌক্তিক ভিড় থেকে মুক্ত হলেন। এখন ভক্তরা খুব সমাজে বাবা বিশ্বনাথের পুজো দিতে পারবেন। গঙ্গা-আরতি দেখাও এখন আগের থেকে সহজ। সব থেকে বড়ো কথা কাশী করিডোর করার জন্য যেসব দোকানপাট সরানো হয়েছে বা বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সরকার। বিকল্প দোকান এবং বাসস্থান দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে সরকার। এই নিয়ে কারোর কোনও অভিযোগের কথা শুনিনি। বর যেসব বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়নি তার মালিকরাও চাইছেন অধিগ্রহণ করা হোক। সুতরাং কাশী করিডোর নির্মাণ শুধু একটা ভালো উদ্যোগ নয়, শুভ উদ্যোগ। এর জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই ধন্যবাদার্হ।

ভক্ত সমাগম বেশি হলে ভগবান খুশি হন

বন্ধুগৌরব মহারাজ
প্রভু জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠ

ভক্তের জন্যেই ভগবান। ভক্ত সমাগম বেশি হলে ভগবান খুশি হন। আগে ঘিঞ্জি পরিবেশের জন্য বাবা বিশ্বনাথের পুজো দিতে ভক্তদের অসুবিধে হতো। কাশী করিডোর সেই অসুবিধে দূর করেছে। এখন অনেক সহজেই পুজো দেওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা ছ'জন সাধু আমন্ত্রণ পেয়ে কাশীতে গিয়েছিলাম। সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছি। শুনেছি যাদের দোকানপাট সরানো হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলেও শুনেছি। শুধু একটাই আক্ষেপ। প্রকৃত শিবলিঙ্গটি এখনও উদ্ধার করা যায়নি। সেটি এখনও জ্ঞানবাপী মসজিদের ভেতরে। প্রকৃত শিবলিঙ্গটি যতদিন না উদ্ধার করা যাচ্ছে ততদিন আমাদের আনন্দ নিখাদ হবে না।

জায়গাটা। শিব বলেন, তাহলে তুমি যাও তোমার পছন্দের জায়গায়। আমি পরে মিলবো সেখানে তোমার সঙ্গে। তখন কাশীতে চলছিল দিবোদাসের রাজত্ব। শিব তাঁর পার্শ্বচর নিকুম্ভকে বলেন, রাজার কোনো ক্ষতি না করে জনশূন্য করো এই কাশী। শিবের আদেশে নিকুম্ভ আসে কাশীতে। সেখানে কন্দুক নামে এক নাপিতকে শিবের কথা জানিয়ে বলে, তুমি রাজদ্বারে আমার মূর্তি গড়ে পুজো শুরু করো। প্রচার করো আমার মহিমার কথা। বলো, যা চাইবে, তাই দেব আমি।

কথামতো নিকুম্ভর মূর্তি গড়ে পুজো শুরু করে কন্দুক। প্রচার করতে থাকে এই পুজোর মাহাত্ম্য। আর তাতেই আকৃষ্ট হয়ে প্রজারা আসে দলে দলে। পূর্ণ হয় তাদের মনস্কাম। চারিদিকে ওঠে এই নব-দেবতার নামে জয়জয়কার।

নিঃসন্তান দিবোদাস-মহিষী সুযশা। একসময় কথাটা কানে যায় তাঁরও। তিনিও শুরু করেন সন্তান কামনায় পুজো। দিন যায়—মাস যায়—পূরণ হয় না সুযশার কামনা আর তাতেই ক্রুদ্ধ হন দিবোদাস। তিনি ভেঙে ফেলেন নিকুম্ভের মূর্তি। ক্রুদ্ধ নিকুম্ভ অভিশাপ দিয়ে দিবোদাসকে বলে, এই মূর্তি ভাঙার পাপে ধ্বংস হবে তোমার এই কাশী।

ভীত দিবোদাস রাজধানী সরিয়ে যেন গোমতী তীরে। প্রজারাও চলে আসে সেখানে। ধ্বংস হয় জনশূন্য কাশী। বহু বছর পরে রাজা দিবোদাসই নতুন করে গড়েন কাশী।

ইতিহাসের কথা :

আধুনিককালে কাশীবিশ্বনাথের মন্দিরটি গড়ে তুলেছিলেন হরিশচন্দ্র একাদশ শতকে। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে সে মন্দির ধ্বংস করে মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি আইবক। ৩৬ বছর পর ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বনাথের নতুন মন্দির গড়ে দেন এক গুজরাটি বণিক। এরপরও সেই ভাঙাগড়ার খেলা। মুসলমান শাসকরা বিভিন্ন সময় ধ্বংস করে বিশ্বনাথ মন্দির। আর ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা আবার গড়ে তোলেন সেটি। শেষবার মন্দিরটি ধ্বংস করেন মোগলবাদশাহ ঔরঙ্গজেব ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে। মন্দিরের সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তোলেন তিনি জ্ঞানবাপী মসজিদ।

কাশী করিডোরের উদ্বোধন।

এরপর কেটে যায় ১১১ বছর। তার মধ্যে উদ্যোগ নিলেও কেউই রূপায়িত করতে পারেননি মন্দির গড়ার কাজ। অবশেষে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাই হোলকার জ্ঞানবাপী মসজিদের গায়েই গড়ে তোলেন বর্তমান মন্দিরটি। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়র রাজা দৌলত রাও সিন্ধিয়ার বিধবা রানি বৈজা বাই জ্ঞানবাপী মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ৪০টি স্তম্ভের ওপর নীচুছাদের একটি চত্বর গড়ে দেন। ১৮৩৩ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জ্ঞানবাপী কুয়ো, মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট এবং সন্নিকটে মন্দিরগুলি তৈরি করা হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পঞ্জাবের মহারানি দাতর কৌরের অনুরোধে শিখসম্রাট রণজিৎ সিংহ বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়া সোনায় মুড়ে দেওয়ার জন্য একটন সোনা দান করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নেপালের রাজা সাতফুট উঁচু পাথরের একটি নন্দী-বৃষ দান করেন। এটি মন্দির চত্বরের পূর্বদিকে রয়েছে। স্বর্ণ-শিখর বিশ্বনাথ মন্দিরকে স্বর্ণ-মন্দিরও বলা হয়। ১৯৮৩ খিস্টাব্দে কাশী মন্দিরটি পরিচালনার ভার তুলে দেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশ সরকারের হাতে।

বিশ্বনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ :

বিশ্বনাথ মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে একটি রুপোর বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ৬০ সেন্টিমিটার উঁচু, ৯০ সেন্টিমিটার পরিধির শিবলিঙ্গটি। মন্দিরের চারদিকে রয়েছে চারটি দরজা। ফলে দর্শনার্থীরা যে কোনো দিক থেকেই দর্শন করতে পারেন শিবলিঙ্গকে। দেখতে পান আরতি ও পূজাও। বিশ্বনাথের গলি বা মূল মন্দির চত্বরে রয়েছে কালভৈরব, দণ্ডপাণি, অবিমুক্তেশ্বর, বিষ্ণু, বিনায়ক, শনীশ্বর, বিরুপাক্ষ এবং বিরুপাক্ষ গৌরীর ছোটো ছোটো মন্দির। মন্দিরের মধ্যেই আছে জ্ঞানবাপী নামে একটি কুয়ো। কথিত আছে, মুসলমান আক্রমণের সময় মূল শিবলিঙ্গকে নিয়ে প্রধান পুরোহিত এই কুয়োয় ঝাঁপ দেন। বিশ্বনাথ মন্দির ছাড়া অন্নপূর্ণা মন্দির, কেদারেশ্বর মন্দির, মণিকর্ণিকা ঘাট ইত্যাদি কাশীর অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প :

ঘিঞ্জি বিশ্বনাথের গলি এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও ঘাটগুলি সংস্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক স্বপ্নের প্রকল্প নেন। যে মন্দির চত্বর ছিল মাত্র তিন হাজার বর্গফুট জুড়ে, তার সম্প্রসারণ করে পাঁচ লক্ষ বর্গফুটের এক অপরূপ চত্বর গড়ে তোলা হচ্ছে। সাতশো কোটি টাকা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়টি নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩৩৯ কোটি টাকা।

গত ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী চারশো মিটার দীর্ঘ ও ৭৫ মিটার প্রস্থের সুসজ্জিত দালান পথ বা করিডোরটির উদ্বোধন করার পর কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির আজ বিশ্বের অন্যতম সুসজ্জিত দেবালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। ■

কিংবদন্তীর কাশী, কাশীর কিংবদন্তী

নিখিল চিত্রকর

দিব্য কাশী ভব্য কাশী। প্রায় আড়াই শতাব্দী পরে পুনরুজ্জীবন পেল বিশ্বের প্রাচীনতম শহর কাশী। নব কলেবরে সেজে উঠেছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। ঈশ্বরভক্ত মানুষদের মতে, কাশী শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ড নয়, এটি এমন একটি দ্বারপথ, যা বিশ্বের অগণিত মানুষকে তার আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করে। তাই ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে অজস্র মানুষের ঢল নামে বারাণসীর ঘাটে ঘাটে। যে সময়ে প্রাচীন গ্রিক শহর এথেন্স স্থাপনের কথা ভাবাও যায়নি, রোম যখন গড়ে ওঠেনি, মিশরে যখন পিরামিডের নকশা তৈরি হয়নি, সেই সময়ে বরুণা ও অসি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম কাশী। বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, 'বিশ্বে যত কিংবদন্তী শোনা যায়, সেগুলির থেকেও প্রাচীন কাশী।' তাঁর মতে বারাণসী তৈরি হয়েছিল একটি যন্ত্র অর্থাৎ একটি কার্যকর শক্তি পদ্ধতির আকারে, যা মহাজগতের সঙ্গে মানবজাতিকে সংযুক্ত করে। আর এই সংযোগকেই বলা হয়েছে কাশী বা আলোকস্তম্ভ। যা ব্যক্তি মানুষকে অস্তিত্বের গভীর মাত্রায় পৌঁছে দেয়। একই ছন্দে জন্ম-মৃতুর সহাবস্থান নিয়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ শহর কাশী।

● খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীতে সুহোত্র-পুত্র কাশ্য এই মহানগর পত্তন করেন। কাশ্যের নাম অনুসারে নাম হয় কাশী।

● বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্তী বারাণসীকে বলা হয় ইতিহাস প্রসূতা।

● যুগে যুগে বারাণসীকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কখনো কাশিকা (উজ্জ্বল), অবিমুক্ত (শিব যে স্থান কখনও ছাড়েন না), আনন্দবন ও কখনো রুদ্রবাস (রুদ্রের নিবাস)। বৌদ্ধ যুগে তীর্থযাত্রীরা বারাণসীকে কাশী নামে অভিহিত করতেন। সেই থেকেই কাশী নামটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা পায়।

বারাণসীর সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো— দশাশ্বমেধ ঘাট। পুরাণ অনুযায়ী দিবোদাস নামে জনৈক কাশীরাজ এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এখানে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামে মহাদেবের দুই বিভূতি অধিষ্ঠান করেন।

● দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বাদশ জোতির্লিঙ্গের অনত্যম বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ। বলা হয়, কাশী স্বয়ং মহাদেবের খুব পছন্দের স্থান। সাধু-সন্তরা বলেন, কাশী পৃথিবীর কোনও অংশ নয়। শিব তাঁর ত্রিশূলে কাশীকে ধারণ করে রেখেছেন।

● বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর অন্যতম বারাণসী। কয়েক হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস এখানে আজও জীবন্ত।

● প্রাচীনকালে বারাণসীকে কেন্দ্র করে শিক্ষার প্রভূত প্রসার ঘটেছিল। তাই বারাণসী শিক্ষানগরী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

● হিন্দু ধর্মের পবিত্র সপ্তপুরীর মধ্যে কাশীকেও গণ্য করা হয়। স্কন্দপুরাণেও উল্লেখ রয়েছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের।

● ৬৩৫ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ভারত ভ্রমণে আসা চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ লিখিত 'ভারত বৃত্তান্ত' গ্রন্থে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের বর্ণনা আছে।

● মহম্মদ ঘোরি, জৌনপুরের মাহমুদ শারকি ও ঔরঙ্গজেব বিভিন্ন সময়ে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির আক্রমণ করে তার সম্পদ লুঠ করে এবং মন্দিরের স্থাপত্য ধ্বংস করে।

● ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকার।

● ১৮৩৫ সালে মহারাজা রঞ্জিত সিংহ মন্দিরের ১৫.৫ মিটার উঁচু চূড়াটি ১ টন সোনা দিয়ে মুড়ে দেন।

বাবা বিশ্বনাথ আবার স্বমহিমায় বিরাজ করবেন

স্বামী দিব্যানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৭৫-এ আমি প্রথম কাশীতে যাই। ১৯৭৪ থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। ওই সময় কাশীতে পরিবেশ খুব ঘিঞ্জি ছিল। মন্দিরের বাইরে জুতো রাখার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। তখনকার দিনে বিশ্বনাথ মন্দির মানে কাশীর অলিগলি দিয়ে মন্দিরে পৌঁছনো। বর্তমান ভারত সরকার, শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা ভাবা যায় না। রামমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এবার কাশী বিশ্বনাথ মন্দির নতুন রূপে সাজাচ্ছে। তবে জ্ঞানব্যাপী মসজিদের ভেতরে যে প্রকৃত শিবলিঙ্গ বিরাজমান তারও পুনরুদ্ধার হবে আগামীদিনে সেই আশাই আমরা করি। বিশ্বনাথ মন্দিরের পিছনের দিকে যে ভগ্ন দেওয়াল, সেই দেওয়ালের ওপরেই ঔরঙ্গজেব মসজিদ করল। তবে দৃঢ় বিশ্বাস বাবা বিশ্বনাথ তার স্বমহিমায় বিরাজিত হবেন। সম্পূর্ণ জায়গা জুড়েই আগামীদিনে মন্দির স্থাপিত হবে।

কাশীতে এখন অপার শান্তির পরিবেশ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন

তীর্থক্ষেত্র ঘুরে আসার পর মানুষ তার স্মৃতিচারণ করেন এবং শয়ন, মননে, নিধিধ্যাসন হতে থাকে। এযাবৎ কাশিতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, এত হইহট্টগোল, ভিড় ভাট্টা ও পরিচ্ছন্নতার অভাব—এগুলি আমাদের খুব পীড়া দিত। বর্তমানে নতুন আঙ্গিকে যেভাবে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরকে সাজানো হয়েছে একেবারে গঙ্গা থেকে শুরু করে প্রশস্ত রাস্তা ধরে বিশ্বনাথ দর্শন করা যাচ্ছে, সুন্দর সুসজ্জিত রূপ প্রকৃত অর্থে তীর্থস্থানের শান্তির বাতাবরণ তৈরি করেছে। শিব মানেই মঙ্গল। যুগ যুগ ধরে এই মহান তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীরা গেছেন, অবস্থান করেছেন, একটি কথায় বলা হয় 'তীর্থ কুরুবন্তী তীর্থানি'। বার বার তীর্থযাত্রীরা ছুটে গেছেন কাশী বিশ্বনাথ ধাম। সেখানে দেবাদিদেব মহাদেব ও মা অন্নপূর্ণার কাছে নিজেদের প্রার্থনা রেখেছেন। হিন্দু ধর্মে কথিত আছে কাশীতে যে মানুষ শরীর ত্যাগ করেন তাকে মুক্তি দেন স্বয়ং মহাদেব। এই মুক্তিলাভের আশায় বহু মানুষ সেখানে শেষ জীবনে আশ্রয় নেন। তাই বিশ্বনাথ ধাম সুন্দর রূপে সুসজ্জিত হওয়ায় একটি অপার শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

● বারাণসীতে ৮৮টি ঘাট আছে। সেগুলির মধ্যে অসি, দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, হরিশচন্দ্র ও কবির ঘাট উল্লেখযোগ্য।

● কাশীর রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে বেনারস ঘরানার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত বিকাশ লাভ করে।

● পুরনো কাশী বিশ্বনাথ মন্দির চত্বরের আয়তন যা ছিল সাম্প্রতিক পুনর্গঠনের পর, বর্তমান মন্দিরের আয়তন বেড়েছে ২৫ গুণ।

● এক সময়ে সংস্কৃত শেখার জন্য বহু বাঙ্গালি পাড়ি দিতেন কাশী। এই শহর বাঙ্গালিকে দিয়েছে বেনারসি শাড়ি, সানাইয়ের সুর, খেয়াল ও ঠুমরি।

● ১৬৬৪ সালে প্রথমবার বারাণসি আক্রমণ করে ব্যর্থ হয় ঔরঙ্গজেব। সেই সময় বারাণসির নাগা সন্ন্যাসীরা কাশী বিশ্বনাথ মন্দির রক্ষা করেন। নাগা সন্ন্যাসীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে পালিয়ে যায় মুঘল সেনারা। জেমস.জি. লচফিল্ড-এর 'ইলাস্ট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া অব হিন্দুইজম, ভল্যুম-১, গ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের' এ হিস্ট্রি অব দশনামি নাগা সন্ন্যাসীজ' গ্রন্থে মুঘল পরাজয়ের ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

● বারাণসীকে ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানী বলা হয়। তুলসীদাসের রামচরিতমানস-সহ একাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ এই শহরে রচিত হয়েছিল। বারাণসীর সংকটমোচন হনুমান মন্দিরটিকে তার স্মরণে 'তুলসীমানস মন্দির' বলা হয়।

● বারাণসীর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম।

● কিংবদন্তী অনুসারে শিব এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাভারতের নায়ক পাণ্ডব ভ্রাতারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ থেকে উদ্ধার পেতে শিবের খোঁজ করতে করতে কাশীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে যে সাতটি শহর মোক্ষ প্রদান করতে পারে, সেগুলির অন্যতম বারাণসী।

● ভক্তি আন্দোলনের বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবীর। বারাণসীর ভক্তি আন্দোলনের অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন রবিদাস।

● ১৫০৭ সালের শিবরাত্রি উৎসবের সময় গুরুনানক এই শহরে আসেন।

● ১৯৩৬ সালে বারাণসিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত ভারতমাতার মন্দির। এই মন্দিরে শ্বেত পাথরের উপর ভারতের মানচিত্র খোদাই করা আছে। জাতীয়তাবাদী নেতা শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও দুর্গাপ্রসাদ খাতরি এই মন্দির নির্মাণের খরচ বহন করেছিলেন।

● বারাণসীর সব থেকে উল্লেখযোগ্য এবং জমজমাট ঘাট হলো—দশাশ্বমেধ ঘাট। পুরাণ অনুযায়ী দিবোদাস নামে জনৈক কাশীরাজ এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাই ঘাটের নাম হয়েছে দশাশ্বমেধ ঘাট। এখানে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামে মহাদেবের দুই বিভূতি অধিষ্ঠান করেন। ■

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের ১১তম রাজ্য সম্মেলন

গত ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের একাদশ তম ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার শহরের সারদা নগরের সারদা শিশুমন্দিরে। সম্মেলনে জেলা ও রাজ্য স্তরের ২৫৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য সভাপতি আশিস মণ্ডল সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর এবং পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সম্মেলনে সাতটি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা, পেশাগত সমস্যা হিসেবে এক

দেশ এক বেতনক্রম, স্বচ্ছ সেকশন রহিত বদলি নীতি, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্য ভাতার দাবি, যোগ্যতামান থাকলে গ্রুপ ডি থেকে করণিক পদে উত্তরণ-সহ সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনাক্রমে আন্দোলনের বিষয়ে আলোকপাত করেন রাজ্য সম্পাদক বাপী প্রামাণিক । রাজ্য সভাপতি আশিস মণ্ডল উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংগঠনকে দৃঢ় করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে নতুন ২১ জনের কর্মসমিতি ঘোষণা করা হয়। রাজ্য সভাপতি আশিস মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক ও রাজ্য কোষাধ্যক্ষ জগদানন্দ নস্কর পুনরায় নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রগীত ও সংগঠনের পতাকা অবতরণের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কেশব ভবনে বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের ১৪৫ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, কলকাতা মহানগরের উদ্যোগে গত ২৮ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার মানিকতলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রদেশ কার্যালয় কেশব ভবনে বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের ১৪৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের প্রপৌত্র বিশ্বরঞ্জন দাস ও মণীন্দ্রচন্দ্র দাস, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ভি ভাগ্যায়াজী। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ বলেন, পুলিনবিহারী দাস সশস্ত্র বিপ্লব ভাবধারার জনক। তিনি লাঠিখেলা ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য

পাড়ায় পাড়ায় আখড়া তৈরি করেছিলেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের শাখা পদ্ধতি এবং পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ড প্রায় একইরকম। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় ডা হেডগেওয়ারও অনুশীলন সমিতর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে যুবসমাজকে এভাবেই লাঠিখেলার মাধ্যমে ক্ষাত্রতেজ জাগাতে হবে। বিপ্লবী পুলিনবহারী দাসের স্মৃতিচারণ করে বিশ্বরঞ্জন দাস বলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে অনুশীলন সমিতির কাজের কথা পৌঁছে দিতে পারলে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের দ্বারাই দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। তিনি পুলিনবিহারী দাসের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

ভি ভাগ্যায়াজী বলেন, সমস্ত হিন্দু সমাজকে একত্রিত ও সংগঠিত করতে হবে। যেকোনো সংস্থার নামে হোক না কেন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক রাখতে হবে, তা হলো হিন্দু সমাজ সংগঠন, হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং ভারতমাতাকে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা।

সক্ষম ও দিশার উদ্যোগে দিব্যাঙ্গজনদের সামুহিক বিবাহ অনুষ্ঠান

দিব্যাঙ্গজনদের সেবায় কর্মরত বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ শাখা এবং দিশার যৌথ উদ্যোগে গত ২ জানুয়ারি বিরাটির শরৎ পার্কে দিব্যাঙ্গ নয়জোড়া বর-বধূর সামুহিক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং বর-বধূদের আশীর্বাদ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমলাকান্ত পাণ্ডে, দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়, সহ সভাপতি ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম, ডাঃ অরুণাভ কুণ্ডু, সদস্য সমতীর্থ চন্দ, সম্পাদক অনীখ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা ডাঃ মধুছন্দা কর, ডাঃ অর্চনা মজুমদার, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে দিশার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মণিকাঞ্চন পাল, সপ্তর্ষি চৌধুরী ও তরুণজ্যোতি তেওয়ারি। আশীর্বাদ ও শুভকামনা প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ও প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ।

হুগলীর বলাগড়ে রাধামাধব শাখার উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার বলাগড় খণ্ডের রাধামাধব শাখার উদ্যোগে এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি ও ন্যাশনাল মেডিকোস অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় একটি চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ডাঃ পি শীলের নেতৃত্বে ১২৬ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তাদের সকলকে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির পক্ষ থেকে চশমা প্রদান করা হবে। ডাঃ প্রভাত সিংহ, ডাঃ অরূপ দাস ও ডাঃ সৌর্য ব্যানার্জি ১১২ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ইউএসএ-এর সরস্বতী পূজা

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ওম শক্তি মন্দিরে ঢাকা জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোশিয়েশন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে প্রথমবার শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা করা হয়। সকালে মঙ্গলঘট স্থাপনের মাধ্যমে পূজা শুরু হয় এবং পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পৌরোহিত্য করেন রঞ্জিত কুমার ভাদুড়ী। কনভেনর ছিলেন শিবশঙ্কর শর্মা। বিকেলে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' গানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানটি সদ্যোপ্রয়াত সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়। অনুষ্ঠানে 'জবাল সত্যকাম' নাটিকা মঞ্চস্থ করা হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন অসীম সাহা, প্রদীপ কুণ্ডু, শ্রীমতী শিখারানি ঠাকুর, সুশীল সিনহা এবং শিশুশিল্পী শান।। স্ক্রিপ্ট পঠনে আশিস রায়। তত্ত্বাবধানে ছিলেন সহ সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত দাস টুটুল, সহ অর্থ সম্পাদক বিমল দাস ও ডিরেক্টর অঞ্জন দাস। ধন্যবাদ প্রদান করেন সিতাংশু গুহ। শিবশঙ্কর শর্মা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শিবাজীর আদর্শে জাতিগঠন করতে চেয়েছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

শিবাজীর গুরু ছিলেন রামদাস স্বামী। তাঁর জন্য সাতরা দুর্গ জয় করার পর সজনগড়ে আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন শিবাজী (১৬৭৩)। গুরুকে অঢেল ধন আর ঐশ্বর্য দান করলেও তাঁকে দৈনিক ভিক্ষায় যেতে দেখে শিবাজী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। গুরুদেবের সাধ মেটাবেন, পণ করলেন শিবাজী। রাজ্যের যা কিছু সম্পদ, এমনকী গোটা মহারাষ্ট্র রাজ্যটাই গুরুকে দান করার শপথ নিলেন। এর জন্য যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করলেন শিবাজী, তৈরি হলো দানপত্র। পরদিন সকালে গুরু রামদাস যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বের হলেন, স্বয়ং মারাঠা রাজ তথা হিন্দু-অস্মিতা-শিবাজী গুরুর পদতলে সমর্পণ করলেন সমগ্র রাজ্য। গুরু শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম, এখন থেকে তুমি আমার গোমস্তা হলে। ভোগসুখী ও স্বেচ্ছাচারী রাজা না হয়ে বিশ্বাস করো, তুমি যেন এক জমিদার প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছো। রাজ্যশাসনের এই দায়িত্বজ্ঞান যেন তোমার থাকে।' ছত্রপতি শিবাজী মেনে নিলেন হিন্দু যোগীর সর্বাধিনায়কত্ব। সেই থেকে শিবাজীর রাজ্য পরিণত হলো এক হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাবাদর্শে-চালিত রাজ্য, এক যোগীরাজ্য। সন্ন্যাসীর গেরুয়াবসন দিয়েই নির্মিত হলো রাজপতাকা।

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ হিন্দু জাতি গঠন সংক্রান্ত নানা ভাষণ ও কাজে বারবার হিন্দু সম্রাট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল গঠনের আহ্বান জানান তিনি এবং হিন্দু সমাজের বিপন্নতার কথা তুলে ধরেন। কারণ ১৯৩৭ সালের পর থেকে বাঙ্গলার রাজনীতিতে মুসলমান আধিপত্যবাদ বাঙ্গালি হিন্দুজীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। নোয়াখালিতেও তার ব্যত্যয় ঘটলো না, গোলাম সারওয়ার ও গোফরানের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির অন্তরালে একদল মানুষ হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল; তারপর যা হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৪০ সালের ৭ মে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল কেমন হবে, তা বলতে গিয়ে স্বামী প্রণবানন্দজী বললেন, 'ছত্রপতি শিবাজী, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের জাতি গঠনের পদ্ধতি যেমন ছিল, আমার হিন্দুজাতি-গঠন আন্দোলনও সেই ধারায় পরিচালিত।' তাঁর আশীর্বাদধন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যাকে 'শিবাজীর কার্যকরীরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়, তিনি

নোয়াখালির হিন্দুদের দুর্দশাকে এবং তার মোকাবিলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিলেন। স্বামীজী এই যাত্রায় দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিবের রুদ্রমূর্তি সঙ্গে নিয়েছিলেন আর সঙ্গে নিয়েছিলেন বাছাই করা বীরদের। —'আমি কোনো কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না, মাথা দিতে পারে, মাথা নিতে পারে— এমন লোক আমার সঙ্গে চলুক।' ত্রিশূল হস্তে আচার্যদেব মঞ্চে সর্বদা সমাসীন থাকতেন, পরিধানে পীতোজ্জ্বল কৌষেয় বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মূর্তিতে শিবাজীর পথে হিন্দুজাতি গঠন ও ধর্মরক্ষার বাণী। তাঁর সাফ কথা, 'হিন্দু শির দিয়েছে, কিন্তু সার দেয় নাই।' ৬ মে পূর্ববঙ্গের বাবুরহাট সম্মেলনেও বললেন, 'আজ প্রত্যেক হিন্দুকে রাণাপ্রতাপের মতো, ছত্রপতি শিবাজীর মতো, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মতো স্বধর্ম ও স্বসমাজের রক্ষার ব্রত ও দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক জাতি-গঠন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে।' বাঙ্গালি হিন্দুর শিরায় শিরায় দুর্জয় বীর্যসঞ্চারের জন্য, হৃদয়ে দুর্দম সংকল্প প্রবাহের জন্য ১৩ মে কুমিল্লার হিন্দু সম্মেলনে স্বামীজী আবার শিবাজী-স্মরণ করলেন— 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ যে পন্থায় যথাক্রমে মারাঠী ও শিখ জাতিকে মহাজীবন দান করেছিলেন, আমি বাঙ্গলায় সেই সংগঠন-পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধপরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল করে তুলতে পারলে হিন্দুসমাজের যাবতীয় তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।'

এরপর দেখা যায় যুগাচার্য হিন্দুদের পাশে সতত অবস্থান করবার এক প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু নেতার সন্ধানে রত হলেন, যার মধ্যে শিবাজীর মতো অকুতোভয় শক্তি সঞ্চারিত আছে। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন আপন মাল্যে বরণ করে নিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে, নিজের সামূহিক-শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন, বাঙ্গালির জন্য এক শিবাজী-প্রতিম নেতা নির্বাচন করে গেলেন। ওই বছরই শৈবপীঠ বারাণসীতে দুর্গাষ্টমীর দিন শ্যামাপ্রসাদকে রুদ্ধদ্বারে ডেকে নিয়ে জাগালেন তার মধ্যে থাকা যাবতীয় উদ্যম ও নৈপুণ্য। প্রণবানন্দ-জীবনীকার স্বামী বেদানন্দ 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবন চরিত' গ্রন্থে খোলাখুলি লিখেছেন, 'নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য মেবারের মহারাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তির সহিত তুলনীয়। ...আচার্যের আশীর্বাদ শক্তিসমৃদ্ধ -শ্যামাপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি একক মহাবিক্রমে অভ্যুত্থান করিলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বাঙ্গলাকে উৎসর্গ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া আনিয়া বাঙ্গালি হিন্দুর দাঁড়াইবার স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। ...বাঙ্গলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের জীবন-মাধ্যমে এইরূপে আচার্যের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালি জাতির রক্ষার সংকল্প রূপায়িত হইয়াছিল।'

স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'মহামৃত্যু কী? (What is Real Death?) তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আত্মবিস্মৃতি' (Forgetfulness of the 'self')। নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া; নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হলো 'আত্মবিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু এক এক চরম আত্মবিস্মৃত জাত। তারা সহজেই তাদের উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে যায়; অপরিমিত অন্যায়- অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয় 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে', আরও পশ্চিমে। দৌড় দৌড় দৌড়! জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশে বাঁধা মুক্তির দৌড়! জলছবিটির মতো গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে দৌড়! মা-বোন-বউ-মেয়েকে মাংস-হাতড়ানো ভয়ংকর পশুর মুখে ফেলে রেখেই নিজের জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না! সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের সহিংসতার ইতিহাস যখন মনে রাখবে বাঙ্গালি— হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা তখনই শুরু হবে।

এখন এই জোরজবরদস্তির জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পলায়নপর হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি ও শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কি তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তানসন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না? পারবে। হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে, প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কারণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। এরজন্য প্রত্যেকের মানসিক শক্তি চাই। শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেই মানুষ মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। মানুষ ভয় পেলে আর শক্তিহীন হলে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি শুনিয়ে যায়। পেশিতে শক্তি না থাকলে সে অমেরুদণ্ডীর মতো আচরণ করে। তখন দু'-চারশো মানুষের জনশক্তিতে ভরপুর গ্রামেও আট দশজন হিংস্র মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঙ্গালির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এক দুষ্ট শক্তি, তাতে বাইরের দেশের বৃহত্তর মদত আছে। সেই পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান। স্বামী প্রণবানন্দজীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে।

(স্বামী প্রণবানন্দের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

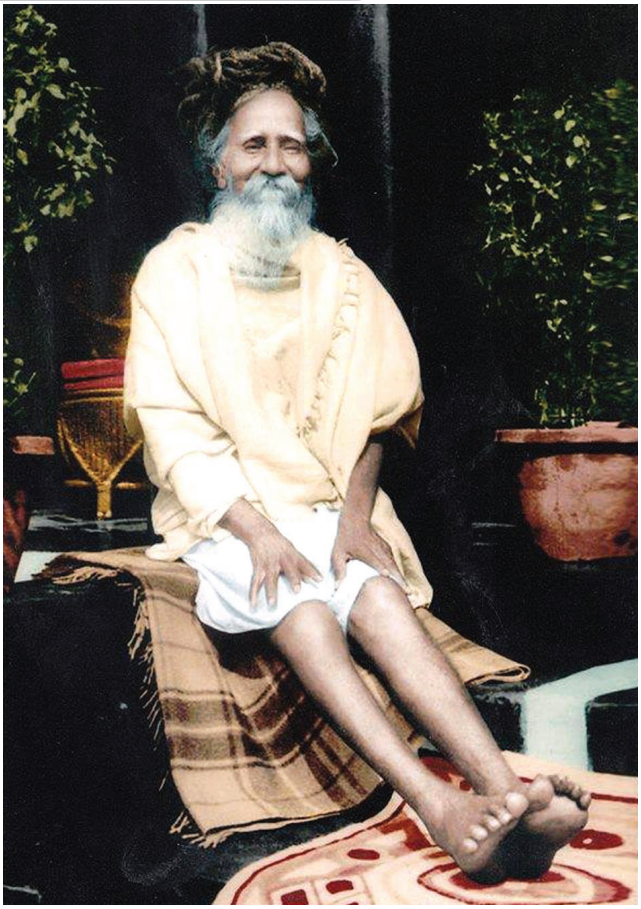

তোমারই নাম সকল তারার মাঝে

সারদা সরকার

সময়টা ছিল ১২৯৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯১ সাল। ফাল্গুন মাসের ৬ তারিখ, সকাল আটটা এক মিনিট, স্বচ্ছতোয়া সুরধুনী গঙ্গার তীরে এক ছায়া সুনিবিড় গ্রাম কেওটা, জন্ম নিলেন উত্তরকালের এক মহাসাধক শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। পিতা প্রাণহরি আর মাতা মাল্যবতীর কোল আলো করে এলেন এই মহাশিশু। শৈশবে মাতৃহারা এই শিশুকে বুকে তুলে নিলেন জগ কামারনি। বিমাতা গিরিবালা দেবী তখনও বালিকাবধূ, তাই এই জগ কামারনিই নিজের কন্যাসন্তানের সঙ্গে একসঙ্গে মাতৃদুগ্ধ ভাগ করে বাঁচিয়েছিলেন। মনে পড়ে ইতিহাসের আরেক ভিক্ষেমা— ধনি কামারনিকে। কে বলতে পারে ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তি কোনো কালপুরুষের সুগভীর ইঙ্গিত কিনা! নামময় শিশুটি নগর প্রদক্ষিণকারীদের নামকীর্তন শুনে পাগলের মতো প্রায় উলঙ্গ হয়ে দৌড় দিতেন— ওই বাজল হরিনামের ডঙ্কা— ধো ধো ধো! এই মহাদিনে, হরিনামের ডঙ্কাকে অনুসরণ করে আমরা সীতারাম আশ্রিত ভক্তপথিকরাও পৌঁছে যাই ওঙ্কারনাথ তীর্থগুলিতে।

জন্মস্থান কেওটা

হুগলী জেলার কেওটায় প্রাণকৃষ্ণ মঠে এসে আমরা থমকে দাঁড়াই। ৬ই ফাল্গুন সকাল আটটা। এক পূজা, আরতি, প্রদীপের আলোয়, স্বস্তিবাচনে, বেদগানে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা ছড়িয়ে যায় ভারত জুড়ে সীতারাম তীর্থগুলিতে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের কণ্ঠে সমবেত তারকব্রহ্ম নাম এই ফাল্গুনের আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রার্থনা করি, 'এমনই করে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক না নামময়।' জাহ্নবীর তরঙ্গভঙ্গে একটি ঘৃতপ্রদীপ ভাসিয়ে বলি— 'অমৃতধারক যেন হতে পারি আমি— উপযুক্ত কলেবর কর মোর তুমি'।

তীর্থক্ষেত্র ডুমুরদহ

বারাণসী সমতুল এই ছোট্ট গ্রামটিতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বহমান। সারি সারি শিবমন্দির, রাধারমণ মন্দির, ব্রজনাথবাটী, কালীতলা, রামাশ্রম, উত্তমাশ্রম সব মিলিয়ে মনে হয় সময় বুঝি থেমে আছে সেই কালেই। পাঁচ বছরের শিশু ওঙ্কারনাথ, সবার আদরের প্রবোধ দেখলেন শিবকে। পরনে বাঘছাল, মাথায় জটা, বাঁ হাতে ত্রিশূল, ডান হাতে ডমরু। রূপকথার গল্পের মতো সেই ঘর আজও সাক্ষী দেয় এক পরমপুরুষের আবির্ভাবের। বিশ্বের সব সীতারামপথিক, আমরা স্তব্ধ হয়ে ধ্যানমগ্ন হই। কানে অনাহত নাদের মতো বাজতে থাক তারকব্রহ্ম নাম। 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে— হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' এই নামের প্রতি প্রাণের ঠাকুর সীতারামের অসামান্য অনুরাগ। তিনি যে নামাবতার। 'ডিভাইন লাইফ সোসাইটি'-র প্রেসিডেন্ট স্বামী চিদানন্দ বলেছিলেন, 'শাস্ত্রে বলেছে যে কলিযুগে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামই একমাত্র আশ্রয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন এই যুগধর্মকে প্রচার করতে, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত করতে। অনেক শতাব্দীর পর ঠাকুর এসেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্যপূর্ণ আরব্ধ কর্মের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণতর রূপায়ণের ব্রত নিয়ে। যদি তাঁকে 'নামাবতার' নামে অভিহিত করা হয়, তাতে নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি হবে না। প্রিয় ঠাকুরটি সত্যই 'নামাবতার'। তাঁর সমগ্র জীবন ও ব্যক্তিসত্তা নামভক্তি ও নামশক্তিরই ভাস্বর উদাহরণ'।

আসুন সবাই মিলে বলি, 'রসনা রটুক সদা সুমধুর নাম— শ্রবণ করুক কর্ণ তব গুণগান— প্রতিভাত হও নিত্য মানসে আমার— তুমিময় করে লও প্রেমপারাবার'।

গুরুগৃহ দিগসুই

আমরা এখন আর একা নই, সাথী হয়েছেন আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ মানসভ্রমণে। সঙ্গে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন। দিগসুই গ্রামে এসে পড়েছি আমরা ১৩১৫ বঙ্গাব্দে। বিংশ শতকের এই সময়ও প্রাচীন নৈমিষারণ্যের সনাতনধারার অনুসরণ যে অসম্ভব নয়, সে দৃষ্টান্ত রেখেছেন সীতারাম। গুরু দাশরথি স্মৃতিভূষণের বাড়িতে বিদ্যার্থী রয়েছেন প্রবোধ। গুরুগৃহে বাস, কঠোর ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, ব্রতপালন, গুরুসেবার আদর্শে উপমন্যু, আরুণিও তুচ্ছ হয়ে যান। শিক্ষাগুরু দাশরথি উঠবেন প্রবোধের দীক্ষাগুরু হয়ে আর সে সঙ্গে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে। পরমগুরুধাম দিগসুইতে নামসংকীর্তন-সহ ভক্তের দল করজোড়ে প্রার্থনা জানায়, হে সাধক, তোমার শরণাগত করে নাও— 'একীভূত করে লও প্রিয়তম প্রাণ— আমার আমি'র নাথ কর অবসান'।

দীক্ষাস্থল ত্রিবেণী

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী— তরঙ্গিনী তিনটি সখী একসঙ্গে ত্রিধারায় উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে অনাদিকাল থেকে। বঙ্গদেশে এই প্রয়াগের নাম মুক্তবেণী। তার তীরে অনাদিকাল থেকে সাক্ষী রয়েছে মনসামঙ্গলে বর্ণিত চাঁদ সওদাগরের কাহিনির নেতি ধোপানির ঘাট, হিন্দুদের পরম তীর্থস্থান। এছাড়াও রয়েছে বেণীমাধব মন্দির, প্রাচীন শিবমন্দির, কালীতলায় ডাকাতকালীর মন্দির, বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দির, অনন্ত বাসুদেব মন্দির। মানসভ্রমণে চলেছি আমরা, নগরসংকীর্তন সঙ্গে করে। ধরে নেওয়া যাক এখন বাংলা ১৩১৯ সাল, ২৯ পৌষ। পৃথিবী সৃষ্টির সময় সেই যে অনন্ত ওঙ্কারধ্বনির শুরু, তা কান পাতলে এখনও শোনা যায় অ-উ-ম— ওম্। প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দীক্ষা নিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু দেব দাশরথি স্মৃতিভূষণের কাছে। শিষ্য প্রার্থনা করলেন, 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়'।

সূর্যদেব দিগন্তরেখায় মিলিয়ে যাচ্ছেন, আকাশে কনেদেখা নরম আলো। গৃহস্থের ঘরে ঘরে বেজে উঠল শাঁখ, ঘণ্টা। ত্রিবেণী শহরের এই ছোট্ট বাড়ির ততোধিক ছোট্ট ঘরটিতে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের এক নিশ্চিন্ত আধ্যাত্মিক যোগাযোগ সৃষ্টি করল এক মাহেন্দ্রক্ষণের। মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হলেন স্বয়ং যোগিবরিষ্ঠ, ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। বহু বছর পরে আবার একদিন এই ঘরে ফিরে আসতে হয়েছিল সীতারামদাসকে তখনও তিনি ওঙ্কারনাথ হননি। কিন্তু সাধনার সেই স্তরে তখন সব ওঙ্কারময় হয়ে গেছে তাঁর। ধ্যানযোগে নাম ভেসে এল ওঙ্কারনাথ। ঘটস্থাপন করে অশ্বত্থপত্রে নাম লিখলেন ওঙ্কারনাথ। ওঙ্কারময় নিরাভরণ ত্যাগী ঋষি এসেছেন সমাজের জন্য, তাপিত পীড়িত জীবকে উদ্ধারের জন্য— 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত— অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'। গরিবকে অন্নদানের জন্য, মেধাবী ছাত্রকে সহায়তার জন্য, অনাথ অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য, গৃহহীনের ঘর বাঁধার জন্যে, মাতৃহারা, সন্তানহারা স্বজনহারা আতুর মানুষকে বুকে জড়িয়ে আপন করে নেওয়ার জন্যেই এই অবতরণ। পাপী-তাপী, ধনী-দরিদ্র, চণ্ডাল-মুচি-মেথর নির্বিশেষে ভালোবাসা দেওয়া বড়ো কম কথা নয়। একদিকে যেমন শাস্ত্রপথিক অতিবর্ণাশ্রমী ছিলেন তিনি, তেমন আবার শ্রীচৈতন্যের মতো ওঙ্কারনাথেরও সব নিয়ম কানুন ভেসে গেছে ভালোবাসার স্রোতে, ত্রিবেণীর গঙ্গার জোয়ারে সেদিন সেই ইঙ্গিতই ছিল।

মহেশতলা শ্রীশ্রী কমলামাতা আশ্রম

সঙ্ঘজননী কমলামাতার আশ্রমে এসে দাঁড়াই আমরা। এখানে সাধক তাঁর শক্তিস্বরূপিণী মহাশক্তির সঙ্গে যুগল লীলা করছেন। যেমন 'রাম-সীতা', 'শিব-দুর্গা', 'রাধা-কৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ-সারদা' ঠিক তেমনই এখানে ঠাকুর সীতারাম তাঁর সহধর্মিণী কমলাদেবীর সঙ্গে একাসনে বিদ্যমান। কমলা মাকে লিখেছিলেন— '...আমরা দুটি জ্যোতির কণা, সংসারকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নেমেছি'। —আদর্শ গৃহী হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন— পরম লাভের জন্যে 'যাইতে হবে না কাননে কান্তারে। ত্যজিতে হবে না আত্মীয়স্বজন'। একই জীবনে পালন করেছেন পুত্র, শিষ্য, গুরু, স্বামী, পিতা সবকটি ভূমিকা। যেন নিরাসক্ত জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছেন' এবারে এসেছি মঠ, মিশন, সন্ন্যাসী তৈরি করতে নয়, এবারে এসেছি আদর্শ সংসারী তৈরি করতে। সংসারগুলোকে আশ্রমে পরিণত করতে।' কমলা মা সাধারণ নারী নন, হতে পারেন না! সতীত্বের সনাতন আদর্শে ভারতনারীকে উদাহরণ দেবার জন্যেই বুঝি তাঁর এই সংক্ষিপ্ত লীলা।

ভূদেব চতুষ্পাঠী

'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ভবেৎ'।। প্রকৃত ঋষি কখনও আত্মদর্শনে থেমে থাকেন না। জগৎকল্যাণের জন্য তাঁকে নেমে আসতে হয় মাটির পৃথিবীতে। সীতারাম তখন তরুণ তপস্বী। চব্বিশ বছর বয়স। অপার্থিব উন্মাদ অবস্থা। বিশ্বচরাচরের কোনো খবর তাঁর কানে পৌঁছবে না। বদ্ধপদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ অবতরণ হয় দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্বতীর। ইস্টমন্ত্রের মন্ত্রধ্বনি নিয়ে চলে তাঁকে জ্যোতির্ময় নাদলোকে। দর্শন হয় দ্বিতীয়বার। ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে আসে। আমাদেরও মানসভ্রমণ শেষ হয়, ভোর চারটের চটকলের কর্কশ বাঁশীর আওয়াজে। এক ঘুমঘোর ছিল যেন। প্রভাতী সুরে বাজতে থাকে মহামন্ত্রনাম। ভক্তরা যেখানে শ্রীহরিনাম করেন সেই জায়গা ছেড়ে তাঁর যাবার সাধ্য কী। তাই বুঝতে পারি তিনি আছেন, আমাদের মধ্যেই— ভালোবাসায় জড়িয়ে রেখেছেন আজও। প্রার্থনা মন্ত্র ধ্বনিত হয় জগৎ জুড়ে 'অমৃতে মিলাও নাথ নাশিয়া মরণ, জোতির্ময় দয়া করি দাও দরশন'। □

শিব-মাহাত্ম্য কথা

রামানুজ গোস্বামী

''তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।।''

মহাদেবকে প্রণাম জানাই, 'হে মহেশ্বর, তোমার মহিমাময় যে তত্ত্ব, তা আমি কিছুই জানি না। তুমি কেমন, তা আমার জানা নেই। তাই তুমি যেই রূপ বা যেমন, তোমাকে সেই রূপেই প্রণাম জানাই।'

শিব কে? এটি একটি খুবই বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এককথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিশদে ব্যাখ্যার। এই প্রবন্ধে আমরা এরই উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করব।

শিব প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটি না বললেই নয়, তা হলো— 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। এটি দেবাদিদেব প্রসঙ্গে একটি বহুল প্রচলিত উক্তি। এই মহাবিশ্বে যা কিছু সত্য ও শাশ্বত তাই হলেন শিব। অন্যদিকে যা কিছু শিব, তা সবই সুন্দর। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, 'শিব' অর্থে জগতের যাবতীয় পবিত্র, মঙ্গলময় ও কল্যাণকর বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে। তাই যখনই আমরা কোনও সুন্দর, পবিত্র, দিব্যভাব ও গুণাবলী সম্পন্ন এবং কল্যাণময় বস্তু বা বিষয়ের সম্মুখীন হই, তখনই এটা মনে রাখতে হবে যে, শিবই এই সকল রূপে অবস্থান করছেন। তাই, এই সবই হলো শিবেরই এক একটি রূপ ও গুণের প্রকাশ। এই জগতে যে তিনটি গুণ রয়েছে, তা হলো যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ভগবান শিব একাধারে যেমন এই তিন গুণেরই অধিকারী; আবার অন্যদিকে তিনি ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ তিন গুণেরই অতীত। তিনি সগুণ, আবার নির্গুণ। তাই তাঁকে বোঝা বা উপলব্ধি করার এতটুকু সাধ্যও মানুষের নেই। তিনি নিজে কৃপা করে যে ভক্ত বা যে সাধককে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করান বা দর্শন দেন, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব শিবতত্ত্বের পরম জ্ঞানের উপলব্ধি। জগতের ইতিহাসে যত শিবভক্ত মহাপুরুষ বা মহাত্মাদের কথা আমরা জানি, তাঁদের সকলেই শিবের কৃপায় শিবতত্ত্বের

মহিমা সম্যকরূপে অনুভব করেছিলেন। আমরাও যেন দেবাদিদেবের কাছে তাঁর কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা করতে পারি।

শিব একাধারে সাকার আবার নিরাকার। সাকার অর্থাৎ যিনি আকার-আকৃতিসম্পন্ন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, শিবের রূপ কিন্তু দেববিগ্রহ বা শিবলিঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একথা ঠিকই যে, বিগ্রহ বা পটে কিংবা শিবলিঙ্গে আমরা ভগবান শিবের যে রূপ দর্শন করি, তা অবশ্যই মহাদেবের এক একটি রূপ। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এই সমুদয় জগৎই হলো শিবময়। একথার অর্থ এটাই যে, ভগবান শিবের থেকেই যাবতীয় যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁর দ্বারাই পালিত হয় এবং সব শেষে তাতেই লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। তিনি নিজে এই জগতের আধার ও আধেয় দুইই হয়েছেন। বস্তুত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করে থাকেন। নামে পৃথক হলেও আসলে এঁরা কেউই কিন্তু পৃথক নন। তত্ত্বগত ভাবে এঁরা এক ও অভিন্ন। তাই বলা হয়েছে যে—

''ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা চ ত্বং বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ।
ত্বং শিবঃ শিবদোহনন্তঃ সর্বসংহারকারকঃ।।''

দেবতাদের মধ্যে একমাত্র শিবই হলেন 'স্বয়ম্ভু'। তিনিই আদিদেব। অনন্ত জগতে তিনি শান্তির শীতল বারি বর্ষণ করেন, জীবকে সুখ ও আনন্দ প্রদান করেন। সমুদয় দুঃখদুর্দশাকে দূর করেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সাধককে প্রচণ্ড কঠোরতা অবলম্বনও করতে হয় না। তিনি আশু (সত্বর) প্রসন্ন বা তুষ্ট হয়ে থাকেন। তাই তাঁর আর এক নাম আশুতোষ। ভক্ত-সাধকদের কৃপা করবার জন্য তিনি যে সদাসর্বদাই উৎসুক ও আগ্রহী। তাঁর কাছে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই, নেই শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান, নেই ধনী-নির্ধনের ব্যবধান। সকলের প্রতি শিবের কৃপার দুয়ার সদাসর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। এই কৃপা লাভ করবার জন্য প্রয়োজন ভক্তি আর শ্রদ্ধার। তবেই সেই ভক্ত শিবের কৃপা লাভ করতে পারে। শিব প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ মহিমার কথা না বললে চলে না। তা হলো এই যে, দেবতাদের মধ্যে একমাত্র দেবাদিদেব শিবই হলেন ত্রিনয়নের অধিকারী। তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে নির্গত হয় (বলা ভালো যে, বর্ষিত হয়) ভয়ংকর অগ্নি। এই তৃতীয় নয়নের অগ্নির দ্বারাই তিনি মদনভস্ম বা কামদেবকে ভস্মীভূত করেছিলেন।

শিব প্রসঙ্গে আলোচনায় এবারে একটু শাস্ত্রের কথায় আসা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বেদের প্রসঙ্গ। বেদে রয়েছে শিব তথা রুদ্রের প্রসঙ্গ। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদ ও উপনিষদ— সর্বত্রই আছে রুদ্র প্রশস্তি। ঋগ্বেদের মতে রুদ্র একদিকে যেমন মহা উগ্র ও ভয়ংকর, অন্যদিকে তিনি পরম করুণাময়।

'রুদ্' অর্থে রোদন বোঝায়। তিনি সংহারকর্তা। তাই তিনি জীবের রোদনের কারণ। তাই তাঁর নাম রুদ্র। আবার পাশাপাশি তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠও বটে। একই সঙ্গে তিনি কৃষিকাজ তথা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকেন। আবার এই রুদ্র দেবতাকে অগ্নিও বলা হয়। প্রসঙ্গত, সামবেদে বলা হয়েছে যে, 'অগ্নিরূপী রুদ্র উচ্যতে'। উল্লেখ্য, অগ্নির যে শক্তি, তাকেই এখানে রুদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। রুদ্র তাঁর ভক্তদের সদাসর্বদাই সকল প্রকার দুঃখদুর্দশা থেকে রক্ষা করে থাকেন। যজুর্বেদেও তাঁকে সর্বব্যাধি-নিবারক বলে অভিহিত করা হয়েছে, সুতরাং এটা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না যে, অনেক মূঢ় ব্যক্তি যে শিবকে অনার্যদের দেবতা বা জনজাতিদের দ্বারা সেবিত এবং বেদ-বহির্ভূত বলে উল্লেখ করবার চেষ্টা করে থাকে, তাদের বক্তব্য হলো একেবারেই হাস্যকর। শিব চিরদিনই বৈদিক দেবতা এবং বৈদিক যুগ থেকেই ঋষি-মুনিরা তাঁর উপাসনা করেছেন। তিনি ত্রিশূলধারী ভৈরব এবং এই জগতের অধীশ্বর।

এবারে পৌরাণিক কালে ভগবান শিবের প্রশস্তি কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। শিবকে বলা হয় পঞ্চবদন। তাঁর পঞ্চমুখের নাম যথাক্রমে— ঈশান, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত ও তৎপুরুষ। তাঁকে 'সর্বগুণবিভূষিত' বলা হয়েছে। তিনি পশুপতি। তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে পশুরাও বঞ্চিত হয় না। তাঁর অনুচর তথা সহচর ভূত-প্রেতের দল। রুক্ষ জটাজাল, চিতাভস্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, রুদ্রাক্ষ ও চন্দ্রকলা তাঁকে অপরূপ সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। তাঁর বিচরণের এক প্রধান ক্ষেত্র হলো শ্মশানভূমি। শিব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে—

'পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং
বসানং বরেণ্যম্।
জটাজুটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গ্যবারিং মহাদেবমেকং
স্মরামি স্মরারিম্।।'

যিনি শিব, পশুপতি, সমস্ত পাপের নাশ করেন, তিনি ব্যাঘচর্ম পরিধান করে থাকেন, যাঁর জটাজালে আবদ্ধ হয়েছেন স্বয়ং সর্বকলুষনাশিনী গঙ্গামাতা, সেই মহাদেব শঙ্করকে স্মরণ করি। এবারে এই প্রসঙ্গে আরও একটি স্তোত্রের কথা উল্লেখ করি। এটি শিবভক্তদের একটি অত্যন্ত প্রিয় ও সুপরিচিত স্তোত্র—

''কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসার-সারং ভুজগেন্দ্রহারং
সদাবসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিতং নমামি।
কৈলাসপীঠাসন মধ্যসংস্থং ভক্তৈশ্চ নন্দ্যাদিভিঃ সেব্যমানং
ভক্তার্তিদাবানলমপ্রমেয়ং ধ্যায়েৎ উমালিঙ্গিত বিশ্বরূপম্।।''

—'কর্পূরের মতো উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ যিনি কৃপাার সাগর করুণাঘন মূর্তি, সমস্ত সংসারের একমাত্র অবলম্বন— বাসুকীনাগ যাঁর কণ্ঠের ভূষণ— তিনিই আমার হৃদয়পদ্মে স্বয়ং দেবী ভবানীর সঙ্গে নিত্য অধিষ্ঠিত হোন। তাঁদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। কৈলাস পর্বতই যাঁদের পীঠভূমি যেখানে ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দী প্রমুখ সহচর নিত্য তাঁদের সেবায় বিরাজিত, আমাদের সংসার অনলে প্রজ্বলিত দুঃখ কষ্টের সংসারে একমাত্র শান্তিপ্রদাতা দেবীপার্বতী উমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর। তাই তোমার এই বিশ্ববন্দ্য বিগ্রহদ্বয়কে প্রণাম।'

এবারে, পৌরাণিক মতে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। শিবপুরাণে বলা হয়েছে যে, পুরাকালে একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিজেদের মধ্যে প্রবল বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। কার ক্ষমতা বেশি এবং কে কার থেকে বড়ো, এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও বিবাদ শুরু হয়। একসময় তাঁরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়ে পড়লেন। এই বিষয়ে লিঙ্গপুরাণে রয়েছে যে—

''বিবাদশমনার্থং চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নং আবয়োঃ মধ্য অদ্ভুতম্।
জ্বালমালা সহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্।
ক্ষয়বৃদ্ধি বিনির্মুক্তং আদিমধ্যান্তবর্জিতম্।
অনৌপম্যম্ অনির্দিষ্টম্ অব্যক্তম্ বিশ্বসম্ভবম্।।

অর্থাৎ— 'তাঁদের সেই যুদ্ধকালে দু'জনের মধ্যে এক অদ্ভুত জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হলো। সহস্র শিখা সমুজ্জ্বল প্রলয়কালীন অনলতুল্য আভাময়। কোনো বস্তুর সঙ্গেই তার তুলনা নেই। আদি, মধ্য অন্তহীন বিশ্ববীজ অনির্দেশ্য অব্যক্ত সেই ভাস্বর লিঙ্গ চতুর্দিক আলো করে সেখানে আবির্ভূত হলেন।'

এদিকে অকস্মাৎ সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গমূর্তিকে সেই স্থানে আবির্ভূত হতে দেখে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সকলেই বিস্মিত হলেন। ব্রহ্মা নিজের হংস বিমানে করে এঁর ঊর্ধ্বদিকে সন্ধান করতে চললেন। বিষ্ণু বরাহ অবতার রূপ ধারণ করে এঁর নিম্নদিকের সন্ধানে চললেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁরা এঁর আদি-অন্ত কিছুই খুঁজে পেলেন না। বিস্মিত হয়ে অতঃপর তাঁরা সেই লিঙ্গের যথাক্রমে দক্ষিণ-উত্তর ও মধ্যস্থানে জ্যোতির্ময় অ-উ-ম এই বর্ণত্রয় দর্শন করলেন। ধীরে ধীরে এই জ্যোতির্মণ্ডলে আবির্ভূত হলেন পঞ্চবক্ত্র মহাদেব স্বয়ং। বলা হয়েছে—

''বৃষাকপয়ে শর্বায় কর্তে হতে নমোঃ নমঃ
শিবায় শিবরূপায় ব্যাপিনে ব্যোমরূপিণে।
নমো নিধীনাথ পতয়ে লিঙ্গিনে সিদ্ধরূপিণে
তেজসে তেজসাং ভর্তে নমস্তে সর্বরূপিণে।।''

অতঃপর স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে শিব তখন স্বরূপ ধারণ করে অবস্থান করতে লাগলেন। এই ভাবেই শিবলিঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দ্বারাই তিনি সর্বপ্রথম পূজিত হয়েছিলেন।

আগেই যেকথা বলেছি যে, শিবলিঙ্গ একটি প্রতীক। এর মধ্যে নিহিত আছে অত্যন্ত গূঢ় তাৎপর্য। বলা হয় যে, একদিকে যেমন এটি শিব ও শক্তির অভেদ ভাবনাকে সূচিত করে, তেমনই এটাও বলা হয়েছে যে, আকাশ হলো লিঙ্গ আর পৃথিবী হলেন তাঁর যোনি পীঠ। যাই হোক, সীমিত পরিসরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তাই এবারে অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক।

শিবলিঙ্গের উপাসনায় ভক্তের সকল কামনা পূরণ হয়ে থাকে। ভক্তকে অদেয় ভগবানের কাছে কিছুই নেই। তাই যুগে যুগে ভারতের কত মুনি-ঋষি, সাধু-মহাপুরুষেরা সাধারণ মানুষকে শিবের উপাসনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। শিবময় এই ভারতভূমিতে রয়েছে অগণিত শিবমন্দির। তার মধ্যে আচার্য শঙ্কর দ্বাদশ শিবলিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে চিহ্নিত করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থান করেন। একে একে জোতির্লিঙ্গসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো— বিশ্বনাথ, সোমনাথ, কেদারনাথ, নাগেশ্বর, ভীমাশঙ্কর, ত্র্যম্বকেশ্বর, মল্লিকার্জুন ও রামেশ্বর। উল্লেখ্য যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের পর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্তির জন্য সেতুবন্ধ রামেশ্বরমে শিবের আরাধনা করেছিলেন। সেই জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ নামে পরিচিত। এছাড়াও ভারতে রয়েছে শিবলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ইত্যাদি।

যুগে যুগে ভারতের কত মুনি-ঋষি, সাধু-মহাপুরুষেরা সাধারণ মানুষকে শিবের উপাসনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। শিবময় এই ভারতভূমিতে রয়েছে অগণিত শিবমন্দির। তার মধ্যে আচার্য শঙ্কর দ্বাদশ শিবলিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে চিহ্নিত করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থান করেন।

শিব ভারত তথা সমস্ত বিশ্বের হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও আরাধ্য দেবতা। একদিকে তিনি আদর্শ গৃহী, আবার অন্যদিকে তিনি পরম ত্যাগী। তিনি যোগীশ্রেষ্ঠও বটে, আবার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। তন্ত্র ও পুরাণের তিনি বক্তা ও ব্যাখ্যাকার। এহেন শিবের মহিমার কথা বলে শেষ করা যায় না। শিবের আরাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হলো শিবরাত্রি। অনেকে এই উৎসবকে মহাশিবরাত্রিও বলে থাকেন। এবারে এই প্রসঙ্গে কিছু বলা যাক। শিবপুরাণে বলা হয়েছে— এই শিবরাত্রির দিনে উপবাসী থেকে শিবের আরাধনায় সহজেই মহাদেবের কৃপা লাভ করা যায়। শিব বেলপাতা ও গঙ্গাজলেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। ভক্তের ডাকে তিনি একটুতেই সাড়া দেন। তাই হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রত্যেকেই শিবের আরাধনা করে থাকেন।

দেবাদিদেব শিব প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা করা সম্ভবই নয়। তবুও যথাসাধ্য তাঁর মহিমা প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে আলোচনার চেষ্টা করা হলো। শিবের মাহাত্ম্য ও মহিমা এই ভারতে (তথা সমগ্র বিশ্বেই) যুগ-যুগ ধরে কীর্তিত হয়ে আসছে। ইদানীং কিছু স্বার্থান্বেষী, নীচ মনোভাবাপন্ন এবং সর্বোপরি হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী শিব প্রসঙ্গে অশ্লীল উক্তির অবতারণা করছে এবং নানাভাবে শিবলিঙ্গকে কলুষিত করবার কথাও বলছে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মেকি মুখোশের আড়ালে চলেছে সহিষ্ণু হিন্দুকে আঘাত করবার ঘৃণ্য কাজ।

এতে সমাজের কিছু মানুষের সমর্থনও রয়েছে। কারণ, হিন্দুকে বা হিন্দুধর্মকে আঘাত করলেও সহিষ্ণু হিন্দু কিছু বলে না। কিন্তু হিন্দুদের এবার সচেতন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। ধর্মের গ্লানি রোধ করাই তো ভগবানের শিক্ষা বা উপদেশ। তাই হিন্দুদের সচেতনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মরক্ষার্থে কাজ করতে হবে। ভগবান শিবের মহিমা উল্লেখ করে তাই বলা যায়—

''অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং
সিন্ধুপাত্রে সুরতরুবরশাখা লেখনি পত্রমূর্বী।
লিখতি যদি গৃহিত্বা সারদা সর্বকালং তদপি
তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।''

—সুতরাং দেবাদিদেব শিবের মহিমা সাধারণ মানুষ কীভাবেই বা বর্ণনা করতে পারে! শিব সকলের কল্যাণ করুন, এটাই কাম্য।

(লেখক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

প্রবাসে ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের ক্রীড়াগৌরব বাড়ালেন আজাজ প্যাটেল

কৌশিক রায়

সম্প্রতি, মুম্বই-এর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিপুল রানের ব্যবধানে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ভারত টেস্ট ম্যাচ জিতেছে বটে। তবে, মুম্বাইতেও জন্মানো একজন বাঁ-হাতি স্পিনবোলারকে চিরকালই দুঃস্বপ্নে দেখবেন বিরাট কোহলি-চেতেশ্বর পূজারা-ঋদ্ধিমান সাহা-রবিচন্দন অশ্বিন-রা। বিশ্বের প্রথম বাঁ-হাতি এবং তৃতীয় বোলার হিসেবে, এক ইনিংসেই ১০টি উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলা, ৩২ বছরের এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনারটি স্পর্শ করেছেন ১৯৫৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ডানহাতি ইংরেজ স্পিনার জিম লেকার-এর ৫৩ রানে নেওয়া ১০ উইকেট এবং ১৯৯৯-তে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কর্ণাটকি লেগস্পিনার অনিল কুম্বলের ৭৪ রানে নেওয়া ১০ উইকেটের রেকর্ড। আজাজের ঘূর্ণি স্পিনের সামনে দিশেহারা ভারতীয়দের মতোই সেদিন, কুম্বলের 'গুগ্‌লি' বোলিং-এর সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিলেন সঈদ আনোয়ার, শাহিদ আফ্রিদি, ইজাজ আহমেদ, মোহাম্মদ ইউসুফ, ইনজামাম উল হক-এর মতো জাঁদরেল পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানরা। আজাজ প্যাটেল-এর দুটি অসাধারণ বলে লেগ বিফোর এবং বোল্ড হয়েছেন পূজারা এবং কোহলি। শুধু তাই নয়। আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিউই টেল এন্ডার রাচিন রবীন্দ্রর

সঙ্গে মাটি কামড়ে, ২৩ বলে ২ রান করে অপরাজিত থেকে, অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা আর অক্ষর প্যাটেলদের বোলিংকে প্রতিরোধ করে কানপুর টেস্ট ড্র-ও করিয়েছেন আজাজ প্যাটেল। প্রবাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রীড়ানক্ষত্রদের ঔজ্জ্বল্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছেন আজাজ।

২০১৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছে আজাজ প্যাটেলের। ১১টি টেস্টেই ৪৩টি উইকেট পেয়ে গেছেন তিনি। ৫টি উইকেট এক ইনিংসে পেয়েছেন বার তিনেক। ইংল্যান্ডের ডেরেক আন্ডারউড এবং ফিল এডমণ্ডস, ভারতের বিষেণ সিং বেদি, মনিন্দার সিং এবং রবি শাস্ত্রীর মতোই বাঁ-হাতে চকিত অফ-ব্রেক বোলিং করে ব্যাটসম্যানদের হতচকিত করে দেওয়ার মুন্সীয়ানা রাখেন নিউ জিল্যান্ডের ঘরোয়া প্লাংকেট শিল্ড টুর্নামেন্ট-এ সবচেয়ে বেশি উইকেট প্রাপক আজাজ প্যাটেল। মাত্র ৮ বছর বয়সেই মুম্বাই থেকে, বাবা-মায়ের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি জমান আজাজ প্যাটেল। তারপর ২৪ বছর বয়সে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট-এর হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটখেলা শুরু হয় তাঁর। ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেটও খেলেছেন একসময়ে শচীন তেন্ডুলকারের টিম-ইয়র্কশায়ারের হয়ে।

আজাজ প্যাটেলের এই দৃঢ় অধ্যবসায় এবং আশাতীত সাফল্য, আরেকবার প্রমাণ করেছে— বিশ্ব ক্রীড়া ক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রবল প্রতাপে নিজেদের প্রতিভার বিকিরণ ঘটিয়ে চলেছেন বিভিন্ন ভারতীয় বংশোদ্ভুত খেলোয়াড়। ১৯৯৮ সালে ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে ফেভারিট ব্রাজিলকে হারিয়ে ফুটবল-মুকুট জিতে নেয় জিনেদিন জিদান-ফারিয়ান বার্থেশ-মার্সেল দেশাই-র ফ্রান্স। ওই ফরাসী দলে ছিলেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্লেয়ার— বিকাশ ধারাসু। অবশ্য, তাঁকে সেরকম একটা সুযোগ দেওয়া হয়নি। ক্রিকেট-বিশ্বে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অবদান নেহাত কম নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলিং দুর্গে স্পিন-এর অলংকরণ তৈরি করেছিলেন সোনি রামাধীন, সুনীল নারায়ণ আর রাজিন্দার ধনরাজের মতো বোলাররা। ১৯৯২ সালের বেনসন-হেজেস ক্রিকেট বিশ্বকাপে, গুজরাটে জন্মানো ডানহাতি স্পিনার দীপক প্যাটেলকে দিয়ে বোলিং-এর গোড়াপত্তন করিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক প্রয়াত মার্টিন ক্রো। ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং-এ শক্ত খুঁটি হিসেবে একসময়ে স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল, ক্লাইভ ওয়ালকট, এভারটন উইক্‌স, স্যার গ্যারি সোবার্স-এর পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভুত রোহন কানহাই-এর নামও বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারিত হতো। সেই ঐতিহ্যকেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে বজায় রেখেছিলেন বাঁ-হাতি আলভিন কালীচরণ ও শিউনারায়ণ চন্দ্রপল। ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা, গায়ানা-ত্রিনিদাদ-অ্যান্টিগুয়া-বার্বাডোজ- এর আখের খেতে কাজ করানোর জন্য জোর করে এঁদের পূর্বপুরুষদের ভারতে থেকে নিয়ে আসে।

এভাবেই ভারতীয় বংশোদ্ভুত ক্রীড়াবিদরা বহু রাষ্ট্রের ক্রীড়াসম্পদ হয়ে উঠেছেন এবং উঠছেন। সাগরপাড়ে থাকলেও তাঁদের মানসবন্ধন কিন্তু জড়িয়ে আছে আসমুদ্র হিমাচলের সঙ্গে। হয়তো মধুকবির মতো তাঁরাও বলতে পারেন ভারতলক্ষ্মীকে— 'রেখো মা! দাসেরে মনে/এ মিনতি তব করি পদে/...প্রবাসে দৈবের বশে/জীবতারা যদি খসে/এ দেহ আকাশ হতে/নাহি খেদ তাহে।

রূপকথার কাহিনিও যেখানে হার মানে

অসিত চক্রবর্তী

শিলচর থেকে একশো কুড়ি কিলোমিটার দূরের একটি পাহাড়ি গ্রাম। নাম লালগেনাই। ছাতাছুঁড়ার পাদদেশে বনজঙ্গল ঘেরা গ্রামটিতে প্রায় কুড়িটি পরিবারের বাস। শুধু রিয়াং জনজাতির লোকরাই বসবাস করে গ্রামে। ওই গ্রামের রিয়াংরা মূলত জুম চাষ ও শুয়োর পালনে সিদ্ধহস্ত। লালগেনাইবাসীর প্রধান জীবিকা জুমচাষ।

ওই দরিদ্র গ্রামটির এক অসহায় পিতা নগেন্দ্র রিয়াং। বয়স পঁয়ত্রিশ। সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্য ২০২০ সালের প্রথম দিকে মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু করোনার জন্য কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্র রিয়াংকে কোয়ারান্টাইনে রাখা হলে নিঃস্ব পরিবার দুটো ভাতের জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। বাবা কোয়ারান্টাইন, মা-ও রোজগারে যেতে পারছেন না, ঘরে ভাত নেই, সন্তানরা চেঁচিয়ে উঠছে দুমুঠো ভাতের জন্য, কিন্তু কে জোগাবে তাদের অন্ন? ভাই- বোনদের চোখের জল দিদি হতিরুং-কে বাধ্য করে কিছু একটা উপায় খুঁজতে। যদি কিছু সজনা পেড়ে বিক্রি করে কয়েকটি টাকার বন্দোবস্ত হয়, এই ভাবনায় সে গাছে ওঠে। বিধি বাম, সজনা পাড়ার সময় ডাল ভেঙে নীচে পড়ে যায় হতিরুং। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায়।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের লোকেদের সহায়তায় প্রথম চেরাগী হাসপাতালে নিয়ে গেলে হতিরুংকে চিকিৎসকরা রামকৃষ্ণ নগর হাসপাতালে পাঠান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে

যাওয়া হলে সিটিস্ক্যান করে ধরা পড়ে মাথার ভেতর রক্তক্ষরণ হয়েছে। চিকিৎসকরা নিউরো সার্জারির জন্য অবিলম্বে শিলং অথবা গৌহাটি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু যাবে কীভাবে? একদিকে বাবা গৃহবন্দি, অন্যদিকে মেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে! অসহায় মা কেঁদে আকুল হয়ে আবেদন করেন মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে, শিলচরে রেখে যদি চিকিৎসা হয়, কিন্তু ওই ব্যবস্থা যে ওখানে নেই! আর গৌহাটি কিংবা শিলং রেখে চিকিৎসা করার ক্ষমতা ওই পরিবারের পক্ষে দিবাস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

হতিরুং রিয়াংকে বাঁচানোর আর্জি জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বার্তা প্রচার করা হয়। এগিয়ে আসেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। বাবা নগেন্দ্র রিয়াঙের জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টে দুদিনের মধ্যেই কয়েক হাজার টাকা জমা পড়ে। মজদুর, সাধারণ নাগরিক, শিক্ষক, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার কর্মী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক প্রতিনিধি, সংবাদসংস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন এনজিও এগিয়ে আসে হতিরুঙের জীবন বাঁচাতে।

গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে হতিরুঙের নিউরো সার্জারি হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পর হতিরুং কথা বলতে শুরু করে। ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও উপত্যকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে হতিরুং রিয়াঙের ওই মর্মন্তুদ কাহিনি প্রচারিত হয়। হতিরুঙের গ্রাম চেরাগী থেকে গৌহাটি পর্যন্ত সহযোগিতার একটি শৃঙ্খল গড়ে উঠে। জনগণের সহযোগিতার পাশাপাশি সরকারি সহায়তা প্রকল্পের থেকে কীভাবে আর্থিক সহায়তা নেওয়া হবে তার ব্যবস্থাও হয়। মাস খানেকের মধ্যেই কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে হতিরুং। হিতাকঙ্ক্ষীরা গৌহাটি থেকে ফেরার রাস্তায় অনেক স্থানে সেদিন বরণ করে নেন হতিরুংকে। সবার কাছেই সেদিন হতিরুঙের ফেরাকে মনে হয়েছিল রূপকথার কোনোও এক কাহিনি। কাউকে অন্তত অর্থাভাবে মরতে হয় না সেটা প্রমাণ হয়েছিল সেদিন।

হতিরুং ফিরে আসে ঠিক, কিন্তু হাসপাতালেই ধরা পড়ে ওর মাথায় টিউমার রয়েছে। স্মৃতিশক্তি কমে আসে ওর। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। এসব নিয়েই বছর কেটে গেছে। হতিরুং রিয়াং তার অসুস্থতা নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল। ২১ এপ্রিল ২০২১-এ ফের একবার শিরোনামে উঠে আসে হতিরুঙের নাম। এবার বিশ্বমঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করবে হতিরুং, এই বার্তায় শিহরিত গোটা বরাক উপত্যকা। সক্ষম দিব্যাঙ্গ সংস্থা ইউনিসেফের ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড পার্লামেন্টের জন্য হতিরুঙের বেঁচে উঠার দুঃখজনক কাহিনিটি পাঠিয়েছিল। ইউনিসেফ সেটাকে স্বীকৃতি দেয় এবং ২৫ এপ্রিল ২০১১, রবিবার, আন্তর্জাতিক শিশু সংসদে আন্তর্জালে অংশগ্রহণ করে হতিরুং।

হতিরুং নিজ মাতৃভাষা ব্রু ছাড়া অন্য ভাষা জানা না থাকায় নিজ ভাষায় মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসার কাহিনিটি তুলে ধরে। সক্ষমের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সম্পাদক মিঠুন রায় সেটাকে ইংরেজি তর্জমা করেন। বেঁচে আসার সেই কাহিনি থেকে বর্তমান ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত সেরিব্রাল পালসি সমস্যার করুণ সমস্যার কাহিনি শুনে ইউনিসেফের এক প্যানেলিস্ট হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন। তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার কথা জানিয়ে একটি বার্তা আসে ইউনিসেফের পক্ষ থেকে। জানানো হয়, কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শিশুর অধিকার রক্ষার্থে ইউনিসেফের একটি প্রতিনিধিদল বরাক উপত্যকা সফরে আসবে। লালগেনাই গ্রামের ওই কন্যার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের বেঁচে ওঠার কাহিনি সত্যিই রূপকথার কাহিনিকে হার মানায়। □

লালপরির গল্প

পরিরাজ্যে হঠাৎ করে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেল। এক গরিব পরির ঘরে জন্ম নিল ফুটফুটে সুন্দর এক লালপরি। এর আগে কখনোও পরিদের ঘরে লাল রঙের পরি দেখতে না পাওয়ার কারণে পরি রাজ্যের সকলে সেই লালপরিকে দেখার জন্য ভিড় করতে থাকল। লালপরির মায়ের বয়স ছিল বেশি। বয়সের ভারে সে কোনো কাজকর্ম করতে পারত না। তাই তাদের সংসারে নিত্য অভাব অনটন লেগেই থাকত। কিন্তু লালপরির জন্মের পর থেকে যেন অবস্থার পরিবর্তন শুরু হলো। প্রতিদিন পরি রাজ্যের বিভিন্ন পরিরা লালপরিকে দেখতে এসে উপঢৌকন দিয়ে যেত আর তা দিয়ে তাদের সংসার ভালোভাবেই চলে যেত। এভাবে দিন কাটতে কাটতে লালপরিরা ধনী হতে শুরু করল। একসময় তারা পরিরাজ্যের অন্যতম ধনীতে পরিণত হয়ে গেল। লালপরির কথা পরিরাজ্য ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যও জানত। দৈত্য রাজার কানে যেন এই খবর না যায় তার জন্য সকলে খুব সচেতন ছিল। কিন্তু এরপরও কথা কি গোপন থাকে? লালপরিরা এত ধনসম্পদের মালিক হওয়ায় হিংসুটে এক পরি দৈত্য রাজ্যের মহা খারাপ দৈত্য হিংসুংকে জানিয়ে দিল। হিংসুং ছিল দৈত্য রাজার বখাটে ছোটো পুত্র। খারাপ কাজকর্ম করে বেড়ায় বলে দৈত্য রাজা তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে লালপরি ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকল। এলাকায় তার অনেক নাম। সবাই তাকে আদর করে পরিরানি বলে ডাকে। সে সবার চেয়ে আলাদা বলে সবাই তাকে চোখে চোখে রাখে। অনেক ধনসম্পদের মালিক হওয়ায় তার দেখাশোনার জন্য কয়েকজন দাসীও নিযুক্ত করা হয়েছে। লালপরির মিষ্টি ব্যবহারে দাসীরাও অভিভূত। একদিন হঠাৎ করে এক দাসী কাজে না আসায় লালপরি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারণ ওই দাসী পরিরানিকে অন্যান্য দাসীর তুলনায় বেশি ভালোবাসত।

দাসীর খোঁজে পরিরানি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু দাসীর বাড়ি না চেনায় পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। আড়াল থেকে সবই দেখছিল খারাপ দৈত্য হিংসুং। কারণ সে-ই ওই দাসীকে জঙ্গলে আটকে রেখেছে। তার উদ্দেশ্য ছিল যেভাবেই হোক পরিরানিকে বাড়ির বাইরে বের করে আনা। হিংসুং পরিরানিকে বাড়ির বাইরে আনতে পেরে খুব খুশি হলো এবং তাকে বন্দি করে নিয়ে গেল পাহাড়ের চুড়োয়। এদিকে লাল পরিকে না পেয়ে তার মা কেঁদে কেঁদে অসুস্থ হয়ে বিছানা নিল। ওদিকে সবাই মিলে পরিরানিকে খুঁজতে বের হলো। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

এদিকে হিংসুং লালপরিকে পাহাড়ের চুড়ায় রেখে চলে এল সেই দুষ্টু পরির সঙ্গে যুক্তি করতে, কীভাবে লালপরিদের ধনসম্পদ হাতানো যায়। দুষ্টু পরি ও হিংসুং যখন কথা বলছে সে সময় অন্য পরিরা তা দেখে ফেলল। হিংসুঙের সঙ্গে পরিরা পেরে উঠবে না বলে তারা রাজার কাছে এর বিচার চাইল। রাজা প্রথমেই সৈন্যসামন্ত দিয়ে সেই হিংসুটে পরিকে ধরে আনল এবং বলল, পরিরানি কোথায় আছে তা যদি সত্যি করে না বলে তাহলে তাকে শূলে চড়ানো হবে।। রাজার মুখে শাস্তির কথা শুনে হিংসুটে পরি রাজার কাছে সব খুলে বলল এবং প্রাণভিক্ষা চাইল। পরিরাজ্যের রাজার সঙ্গে দৈত্যরাজার খুব ভালো সম্পর্ক। তাই পরিরাজা দৈত্যরাজাকে সব কথা খুলে বললেন। দৈত্যরাজা তাঁর দুষ্টু ছেলেকে আটক করে পরিরানিকে ফিরিয়ে দিলেন। লালপরিকে ফিরে পেয়ে সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সবাই রাজার গুণগান করতে লাগল। রাজা পরিরানি ও তার মাকে রাজপ্রাসাদে থাকার আমন্ত্রণ জানালেন। শেষে রাজবাড়িই হলো লাল পরির বাসস্থান। এতে সবাই খুব খুশি হলো।

(চীনা লোককথা অনুসারে)

দীপাঞ্জন ভট্টচার্য

ভারতের বিপ্লবী

পঞ্চানন পালিত

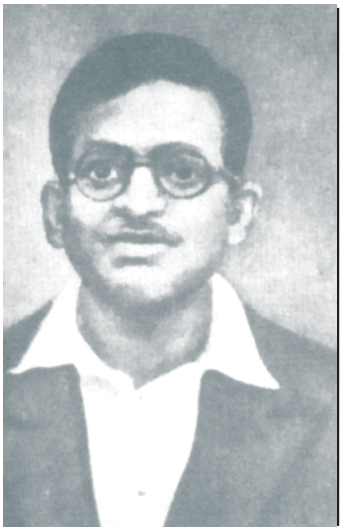

বিপ্লবী পঞ্চানন পালিতের জন্ম বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের এলাকায়। বাবা শরৎচন্দ্র পালিত এবং মা স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধীবাদী শান্তশীলা পালিত। পঞ্চানন পালিত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। এমএ পড়ার সময় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি অবস্থায় ইংরেজ জেলা শাসক পেডি ভারতবাসীর প্রতি অভদ্র উক্তি করলে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। সেই কারণে তাঁর বুকে পদাঘাত করে বুকের পাঁজরা ভেঙে দেওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জানো কী?

- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় কুমারগুপ্তের আমলে।
- ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ভারতের প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট।
- ১৮৫৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বলিদানী মঙ্গল পাণ্ডে।
- এনকেফেলাইটিস রোগে মানবদেহের মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের স্বাভাবিক মাত্রা ০.৩ শতাংশ।
- মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েন্স।
- পশ্চিমবঙ্গে নারী সাক্ষরতার হার পুরুলিয়া জেলায় সবচেয়ে কম।

ভালো কথা

নরেন্দ্রপুরে বিদ্যার্থীব্রত

দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করে আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পড়ার সুযোগ পেয়ে পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীব্রত অনুষ্ঠান হলো। আগের দিন বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা পৌঁছে গিয়েছিলাম। পরদিন সকালে আমরা স্নান সেরে বিদ্যালয়ে পৌঁছালাম। আমার অনেক বন্ধু তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে এসেছে। একজন মহারাজ আমাদের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে তৈরি থাকতে বললেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের ডাক পড়ল। আমরা সবাই মন্দিরে গিয়ে বসলাম। তারপর যজ্ঞ শুরু হলো। আমরা মন্ত্র বলে আহুতি দিলাম। তারপর দুপুরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হলো। বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন হইহই করে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। বাড়ি ফেরার সময় মন খারাপ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে স্কুল শুরু হবে, আমরা একসঙ্গে থাকবো কিন্তু এই দিনটির কথা আমি কোনোদিন ভুলব না।

উদিত দত্ত, পঞ্চমশ্রেণী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

নারী

প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, নবম শ্রেণী, মাদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

নারী সৃষ্টি নারী ধ্বংস নারী জগৎ সংসার,
নারী শুধু সইতে পারে জগতের ভার।
নারী বিদ্যা নারী বুদ্ধি নারী জগতের আশা,
নারী হতে এই দুনিয়া পায় যে ভালোবাসা।
সৃষ্টি করেন এক নারীকে সব দেবতা মিলে,
ধ্বংস করতে অসুরদের মহামায়া রূপে।
সেই নারী আজ অন্নপূর্ণা সেই নারীই পার্বতী,
সেই নারী হয়তো আজও মহাদেবের সতী।
নারী সৃষ্টি নারী ধ্বংস নারী জগৎ সংসার,
নারী বিনা এই দুনিয়ায় সবই অন্ধকার।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

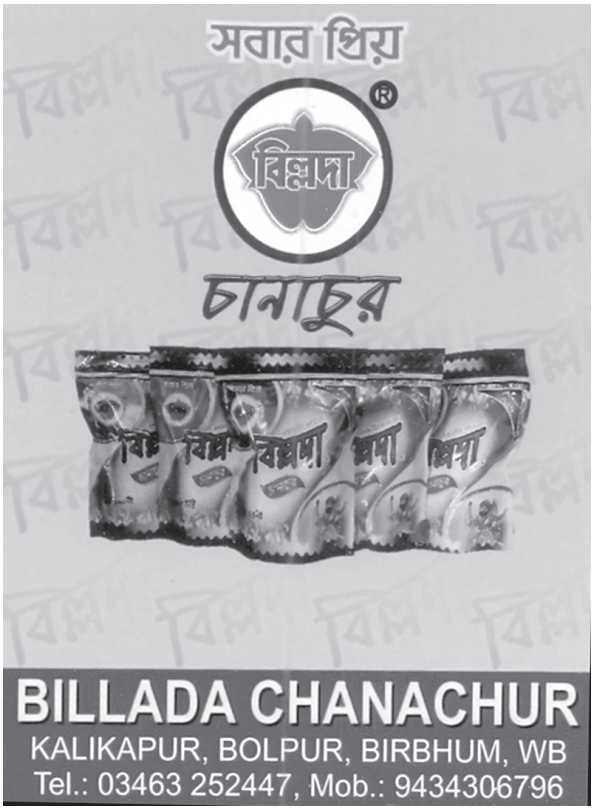

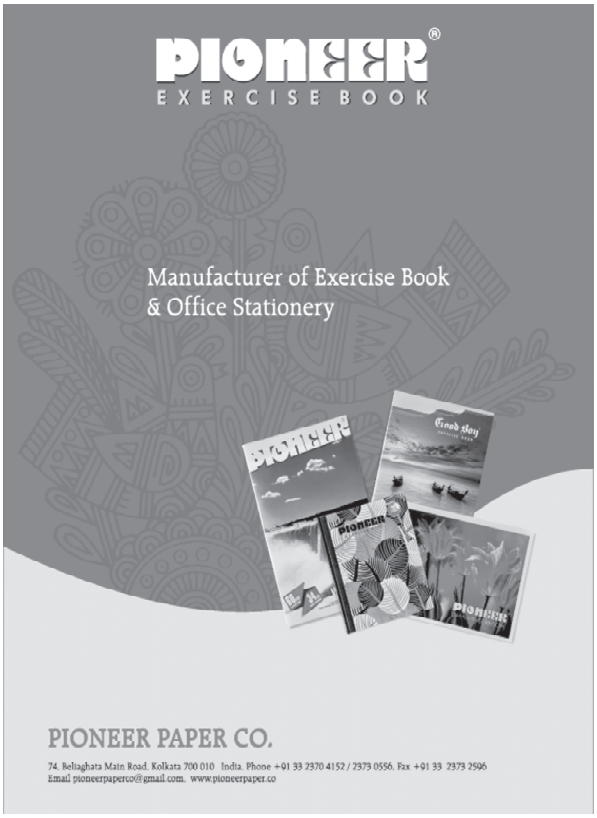

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা হাইকোর্ট সার্ধশত বর্ষ অতিক্রম করার পথে

সুবল সরদার

আমাদের গর্বের ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা হাইকোর্টের ইতিহাস জানতে ফিরতে হবে মহিমান্বিত হাইকোর্ট বিল্ডিঙের গা ছমছম করা ইতিহাসে। তখন হাইকোর্ট বসত ফোর্ট উইলিয়ামে। পয়লা জুলাই, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে হাইকোর্টের প্রথম অ্যানেক্স বিল্ডিঙের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ওই অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে বর্তমান ১১নং কোর্ট এবং ১২নং কোর্ট আছে। ১১নং কোর্টের করিডোরের পাশ দিয়ে আলো আঁধারি স্পাইরাল সিড়ি। এই স্পাইরাল সিড়িটা গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। ১১নং কোর্ট থেকে ওই স্পাইরাল সিড়ির ধাপ ধরে উপরে উঠলে অ্যাডভোকেটদের বার এবং হাইকোর্টের অফিস। যদিও ইংরেজরা ছাড়া ওই সিঁড়ি সাধারণত কেউ কখনো ব্যবহার করত না। তৎকালীন জজদের নিরাপত্তার কারণে ওই সিড়ি তৈরি হয়। বিপ্লবীদের ভয়ে ইংরেজদের পালানোর পথ ছিল ওই সিড়ি। ১১নং কোর্ট থেকে ওই সিড়ি ধরে নীচে নামলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঐতিহ্যবাহী শেরিফের চেম্বার কাম অফিস, হাইকোর্টের অফিস, অ্যাডভোকেটদের বার। আদালত কর্মীরা, পাবলিক লিটিগেন্ট বিকল্প সিড়ি এবং বর্তমানে লিফট ব্যবহার করেন।

এরপর তৈরি হয় হাইকোর্টের মেইন বিল্ডিং। এখানে আছে ১নং কোর্ট মানে চিফ জাস্টিস অব ক্যালকাটা হাইকোর্টের ঐতিহ্যবাহী এজলাস। ফার্স্ট ফ্লোরে অপরূপ কারুকার্য শোভিত দৃষ্টিনন্দন ওই রুম। ওই রুমের দেওয়ালে সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফার্স্টফ্লোর মিলিয়ে আছে কোর্ট রুম, বার। ওই ঐতিহ্যবাহী বিল্ডিঙের কাজ শুরু হয় ১৮৬২ সালে আর শেষ হয় ১৮৭২ সালে। দীর্ঘ ১০ বছর লেগেছিল অ্যানেক্স ও মেইন বিল্ডিং তৈরি করতে। হাইকোর্টের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অ্যানেক্স বিল্ডিং সংলগ্ন ঠাকুরবাড়ি, রাধাকৃষ্ণ ও হনুমানজীর মন্দির।

পরবর্তীকালে তৈরি হয় সেন্টিনারি বিল্ডিং এবং সেসকুই সেন্টিনারি বিল্ডিং। সেসকুই সেন্টিনারি বিল্ডিঙের কাজ শেষ হয় ২০২২ সালে। ওই

বিল্ডিঙের শুভ উদ্বোধন করেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি আলতামাস কবীর। সঙ্গে ছিলেন হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্র-সহ-হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিরা, সময় ছিল রবিবার, ৫ মে ২০১৩ সাল।

প্রসঙ্গত ওই (অ্যানেক্স এবং মেইন বিল্ডিং) নান্দনিক স্মারক বিল্ডিংদ্বয় তৈরি হয় নিওগোথিক শৈলীতে। অক্সফোর্ডের কলেজগুলোর অনুকরণে ওই বিল্ডিংয়ের নকশা রচনা করেছিলেন ডব্লুউ এল বি গ্রানভিলে। আইনের প্রাতঃস্মরণীয় পথপ্রদর্শক মনীষীদের আবক্ষ মূর্তি-সহ নৃত্যরত পরি খচিত আছে হাইকোর্টের করিনথিয়ান কলামগুলোতে। 'বাঙ্গালির হাইকোর্ট দেখানো' সত্যি দেখানো যায়। এমন দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য খোচিত বিল্ডিং দেখলে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়।

ঐতিহ্যবাহী, ঐতিহাসিক বিল্ডিঙের সঙ্গে থাকে ঐতিহাসিক নানা কাহিনি। তৎকালীন প্রথম চিফ জাস্টিসের নাম কী ছিল? কখনইবা সুপ্রিমকোর্ট থেকে হাইকোর্ট হলো? ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গলা দখলের সঙ্গে সঙ্গে আইন শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করে। কোম্পানির প্রথম হাইকোর্টের নাম ছিল 'দ্য মেয়রস কোর্ট'। পরে নাম হয় 'ইন দ্যা হাইকোর্ট অব জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট ইউলিয়াম ইন বেঙ্গল'। তারপর হলো সুপ্রিমকোর্ট— 'দ্যা সুপ্রিমকোর্ট অব জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল'। সময় ২৬ মার্চ ১৭৭৪ সাল।

১৭৭৪ সালে তদানীন্তন বাঙ্গলার গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। স্যার এলিজা ইমপে ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি অন্যায়ভাবে ১৭৭৫ সালে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। লন্ডনে ফিরে গেলে তাঁর ইমপ্রিচমেন্ট হয় যা আইনি ভাষায় 'জুডিশিয়াল রিভিউ' বলে। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ দেখা দিল। ইংরেজরা ওই বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করল। ১৮৫৮ সালে মহারানি ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করলেন। তখন ওই সুপ্রিমকোর্ট পরিবর্তন হয় হাইকোর্টে। প্রথম চিফ জাস্টিস ছিলেন স্যার বারনেস পিকক। তখন হাইকোর্ট মামলা হেরে গেলে আপিল করতে হতো লন্ডনের 'প্রিভি কাউন্সিলে'।

জুরি প্রথা না বললে হাইকোর্টের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। ১৭২৬ সালে প্রথম মেয়রস কোর্টে জুরি প্রথা চালু হয়। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে তৎকালীন সুপ্রিমকোর্ট জুরি প্রথার অধীনে আসে। ১৮৬৯ সালে হাইকোর্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে হাইকোর্টেও জুরি প্রথা চালু হয়। ক্যালকাটা হাইকোর্টের প্রথম ১৯৫০ সালে প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন এস এন মুখার্জি। ভারতবর্ষের তিনটি চার্টার্ড কোর্টের মধ্যে অন্যতম পুরানো আমাদের হাইকোর্ট, ভারতের আলোকবর্তিকা। মৌলিক অধিকার এবং ব্যাক্তিস্বাধীনতার রক্ষা কবজ আমাদের গর্বের ঐতিহ্যবাহী হাইকোর্ট এখন সার্ধশত বর্ষ অতিক্রান্তের পথে। □

ফঃ ৬

মনুসংহিতার উৎস সন্ধানে

স্বরূপকুমার ধবল

মনু নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টি আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে তা হলো মনুসংহিতা। ভারতীয় জীবনধারা ও জীবন পরিচালনার সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো এই মনুসংহিতা। সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, উচিত-অনুচিত, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের দিক্‌দর্শন হলো এই গ্রন্থ। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে সর্বকালীন ও সর্বজনীন সমুন্নত চরিত্রের মনুষ্যাদর্শের বর্ণনায় ঋদ্ধ এই গ্রন্থ।

রমেশচন্দ্র লিখেছেন, 'ভূতত্ত্ববিদগণের মতে পঞ্চনদের মৃত্তিকাই বিশ্বের প্রাচীনতম মৃত্তিকা। তাই প্রাচীনতম সভ্যতাও এই অঞ্চলেই উদ্‌ভূত। তাঁরাই সদাচারপরায়ণ, তাই তাঁরা আর্য বলে পরিচিত। তাঁদের জীবনাদর্শ, রাজ্যশাসন, ধর্মসাধনা এক কথায় মনুষ্যজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক এই গ্রন্থে বিধৃত। সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সমাজবিজ্ঞানী তথা Social Scientist হলেন মনু। (রমেশচন্দ্র দত্ত : ধর্মশাস্ত্র)

বিশ্বের প্রাচীনতম সংস্কৃতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদ। ঋকবেদে মনুর অসংখ্যবার উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। ঋকবেদে মনুকে আদি পিতা রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহম্'। আবার কোথাও আছে, 'বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামনাশ্চ দেবা অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্' (১.৯৬.২)। ঋকবেদে বহু জায়গায় বৈবস্বত মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে অনুমান করা হয় বৈবস্বত মনু ওই মন্বন্তরের প্রাচীনতম মানব যাঁর সৃষ্ট মানবধর্ম সে সময় সমাজে প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ঐত্যরেয়সংহিতা শতপথব্রাহ্মণ, ছান্দোম্যব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরাণ তথা রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদভগবতগীতাতে আমরা মনুর উল্লেখ পাই। সেখানে কোথাও কোথাও স্বায়ংভুব মনু ও প্রাচেতস মনুর উল্লেখ থাকলেও বৈবস্বত মনুকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আর্যজাতির পিতারূপে কল্পনা করা হয়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে ব্রহ্মা মানবজীবনের বিধি- নিষেধসমূহ বৈবস্বত মনুকে অধ্যয়ন করান। মহর্ষি ভৃগু এই জ্ঞান বৈবস্বত মনুর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে অন্যান্য মহর্ষিরা এই মানবধর্ম বিষয়ক শিক্ষা ভৃগুমুনির কাছ থেকে লাভ করেন এবং নিজ নিজ আশ্রমে শিষ্যবর্গকে তা প্রদান করেন। এই মানবধর্ম শ্রুতি রূপে শিষ্যদের মস্তিষ্কে 'স্মৃতিশাস্ত্র' রূপে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাহিত হতে থাকে। এই স্মৃতিশাস্ত্রের শ্লোকসমূহ যখন সংকলিতরূপ পায় তখন তা হয়ে গেল 'সংহিতা'। হিন্দু প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের মধ্যে আমরা ২০টি সংহিতা গ্রন্থের পরিচয় পাই। প্রাচীন মানবধর্মসমূহ যা বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানের মনুসংহিতার রূপ পেয়েছে তা সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রামাণ্যগ্রন্থ।

প্রাচীনতম এই মানবধর্ম সূত্রের প্রথম প্রবক্তা ভৃগুমুনি। বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় অর্থাৎ শেষ অধ্যায়টি ব্যতীত প্রথম একাদশটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটির শেষে কথিত আছে— 'ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং।' এর থেকে বড়ো নিদর্শন আশা করি আর প্রয়োজন নেই। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত আংশিক রূপান্তরিত মনুসংহিতা ভৃগু লিখিত নয়। কারণ সে সময় লেখার প্রচলন শুরু হয়নি। ঋকবেদের থেকেও প্রাচীন শ্রুতি শাস্ত্র এই মানবধর্ম স্মৃতিশাস্ত্র অর্থাৎ মনুসংহিতা। ঋকবেদের থেকে পূর্বেই প্রচলিত ছিল এই মহান মানবধর্মের রীতি-নীতি-বিধি-নিষেধসমূহ, তবেই তো ঋকবেদ তার উল্লেখ করতে সমর্থ হয়েছে। যে নীতির এখনো জন্মই হয়নি সেই নীতিকে তো আর যাই হোক উদাহরণ হিসাবে দেখানো সম্ভব নয়।

কিন্তু মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে দেখা দেবে স্বাভাবিকভাবে। মনুসংহিতা যদি প্রাচীন হয় তাহলে মনুসংহিতাতে কী করে ঋকবেদের উল্লেখ রয়েছে? একটু ঠাণ্ডা মাথায় নিজের বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগালেই আমরা এর উত্তর পেয়ে যাব। ঋকবেদে উল্লেখ আছে মনু ও মনুর মানবধর্মের কথা, সেখানে মনুসংহিতার উল্লেখ কোথাও নেই। কারণ মনুর মানবধর্মের বাণী সংহিতার রূপলাভ করে মনুসংহিতা হয়েছে ঋকবেদ রচনার ১০০০ থেকে ১২০০ বছর পর। ফলত মনু কথিত ও ভৃগু প্রচারিত মানবধর্ম যখন গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাহিত হচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে তখন সেই মানবধর্ম সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। কেননা সময়ের নিরিখে মানবধর্মও কিছুক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদেরও প্রবেশ ঘটে গেল। তারফলে যে স্মার্ত পণ্ডিত প্রাচীনতম সেই মানবধর্মকে সংগ্রহ ও সংকলন করলেন, তখন তা কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং তিনি নিজে যে সময়কালে বর্তমান ছিলেন তখনকার মানবধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে না পেরে মনু ও ভৃগুর নামে বেশ কিছু পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত বিষয়কে অতি সন্তর্পণে সংযোজন করে দিলেন, যা

আমাদের কাছে আজ মনুসংহিতা বলে পরিচিত।

তিনি পারতেন সেসব মানবধর্মকে সংগ্রহ করে নিজের নামে গ্রন্থের নামকরণ করতে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, 'অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোনো কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থ তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজও পর্যন্ত কেহ জানে নাই।'

বিশিষ্ট কিছু গবেষকের বক্তব্যের নিরিখে মনুসংহিতা ও তার রচনাকাল সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকে নিয়ে গবেষণা করেছেন যে সব পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তি, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ, কুল্লুকভট্ট, যাস্ক, অপরার্ক, শঙ্করাচার্য, সর্বজ্ঞনারায়, ধরণীধর, রামচন্দ্র, নন্দনাচার্য, রাঘবানন্দ সরস্বতী, উদয়কর, ভোজদেব, ম্যাক্সমুলার, বুলার, পি.ভি. কেন প্রমুখ।

ম্যাক্সমুলার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, এখানে কোনো সন্দেহই নেই যে, বর্তমানে আমরা যে সমস্ত প্রকৃত ধর্মশাস্ত্রের অধিকারী সেগুলো কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই পূর্বের কোনো না কোনো ধর্মসূত্রের আধুনিক সংস্করণ।

'There can bt no doulet, however, that all the genuine dharmasastras which we passess now, are without any exception, nothing but more modern texts of earlier 'Sutra' works on 'Kuladharmas' belonging originally to certain vedic karanas.' (History of Ancient Sanskrit Literature)

Buhler তাঁর 'Law of Manu' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, মহাভারতের শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে একটি মানবধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ আছে, যার সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ওই মানবধর্মশাস্ত্র ও বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতা হুবহু এক নয়। বুলার শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত এসেছেন যে, মনুসংহিতায় স্মৃতিবিষয়ক যে সমস্ত শ্লোকের উল্লেখ রয়েছে, তা প্রাচীন এক মানবধর্মসূত্র থেকে সংগৃহীত এবং পরবর্তীকালে যাকে কাব্যাকারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 'The Indian Antiquary' জার্নালের গবেষকরা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মানবধর্মসূত্র নামে একটি গ্রন্থের অস্তিত্ব পূর্বে ছিল।

বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতার রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন অনুমান। এখন সেসব পর্যালোচনা করে উৎসে পৌঁছানোর চেষ্টা করা যাক।

(১) মনুসংহিতার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হলেন মেধাতিথি। তিনি আনুমানিক ৮২৫ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম মনুভাষ্য। মনুসংহিতার সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাষ্য এটি। তিনি যে গ্রন্থকে অবলম্বন করে ভাষ্য রচনা করেছেন তা বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতা।

(২) আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বরূপ আবির্ভূত হন। তাঁর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকায় ২০০টির বেশি পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক উদ্ধৃতি রয়েছে মনুসংহিতার।

(৩) শবরস্বামী ৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যে বর্তমান মনুসংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৪) মহাকবি কালিদাস আনুমানিক চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের কবি ছিলেন। তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যে বেশ কয়েকবার মনুর কথা উল্লেখ আছে।

'রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদা মনো র্বত্মনঃ পরম্।' (রঘুবংশম্/১-১৭)

(৫) বৌদ্ধ কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ আনুমানিক ৮০-১৫০ খ্রিস্টাব্দের মানুষ। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সভাকবি। তাঁর রচিত 'বজ্রসূচি' গ্রন্থে তিনি বলেছেন— 'উক্তং চ মানবে ধর্মে।' বর্তমান মনুসংহিতা গ্রন্থে যা পাওয়া যায়।

(৬) মহাভারতের শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে মনুর পরিচয় পাওয়া যায়।

'মনুনা চৈব রাজেন্দ্র গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মানা' (শান্তিপর্ব)

'এবং ধর্মং প্রধানেষ্টং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ' (অনুশাসনপর্ব)

(৭) রামায়ণের বালকাণ্ড ও কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

'অযোধ্যা নাম তত্রাসীৎ নগরী লোকবিশ্রুতা।

মনুনা মানবেন্দ্রণ পুরেব পরিনির্মিতা।।' (বালকাণ্ড/৫.৬)

'শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।

গৃহীতৌ ধর্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং ময়া।' (কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড/১৮.৩০)

(৮) অনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মানুষ ছিলেন শূদ্রক। তাঁর 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের নবম অঙ্কে মনুর বিধান উল্লেখ আছে—

'অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রবীৎ।'

(৯) মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের চুয়াল্লিশতম শ্লোকে বলা আছে—

'পৌণ্ড্রকাশ্চৌদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।

পারদা পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।।'

সুতরাং যবন, কম্বোজ, শক, চীন প্রভৃতি জাতির উল্লেখ থাকার কারণে এটি অনুমেয় যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল।

(১০) চাণক্যের আবির্ভাব কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে। তাঁর রচিত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে বেশ কয়েকবার মনুর উল্লেখ আছে।

(১১) আনুমানিক ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিরুক্তকার যাস্ক স্বায়ংভুব মনুর একটি শ্লোক উদ্ধৃতি করেছেন। শ্লোকটিতে পিতা ও পুত্রের পিতৃধনে সমান অধিকারের কথা উল্লেখ আছে। শ্লোকটি হলো—

'অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্মতঃ।

মিথুনানাং বিসর্সাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।।' (নিরুক্ত/২.৪.১০)

এই শ্লোকটি বর্তমান মনুসংহিতাতে নেই। তবে বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতায় পিতৃধনে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকারের কথা বলা আছে নবম অধ্যায়ের ১৪০তম শ্লোকে।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে যাস্কের সময়কালের পূর্বে স্বায়ংভুব মনুর শ্লোকের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বর্তমান মনুসংহিতায় স্বায়ংভুব মনুর ওই শ্লোক হুবহু না থাকলেও তার বিধান অন্যরূপে লিখিত হয়েছে। অতএব, যাস্কের সময়কাল পর্যন্ত 'মানবধর্মশাস্ত্রের' যে অস্তিত্ব ছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। পরে আনুমানিক ৩০০ থেকে ৪০০ বছর ধরে এই 'মানবধর্মশাস্ত্র' বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে সমাজে যে স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ স্থান পেল তা বর্তমানের মনুসংহিতা। যে মনুসংহিতার অস্তিত্বের কথা আমরা মেধাতিথি, ম্যাক্সমুলারের গ্রন্থে পেয়ে থাকি। দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই 'মনুসংহিতা' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবধর্ম। যার মূল ভিত্তিভূমি হলো প্রাচীন 'মানবধর্মশাস্ত্র।'

বর্তমানে প্রাপ্ত 'মনুসংহিতা' গ্রন্থে মোট শ্লোকের সংখ্যা ২৬৮৫টি, যার মধ্যে বেদ অনুসারী অর্থাৎ বেদের ভাষার অনুসারী শ্লোক হলো ১২১৪টি, আর বেদ বিরোধী অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সংখ্যা ১৪৭১টি। এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের আধিক্যই বেশি যা পরবর্তীকালে মূল ধর্মশাস্ত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন সময়ে। আর্যসমাজের প্রখ্যাত পণ্ডিত তথা মনুস্মৃতি গবেষক ড. সুরেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন, পশুবলি, মাংস ভক্ষণ, শূদ্রদের প্রতি ঘৃণা, নারীদের স্বাধীনতা খর্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে শ্লোকগুলি বর্তমান মনুস্মৃতিতে আমরা পাই তা সবই পরবর্তীকালের সংযোজন। ভাষা তার সাক্ষ্যবহন করছে। এ সম্পর্কে Buhler হলেছেন, 'superfluous and clearly later enlargements.' মনুসংহিতায় এমন অনেক শ্লোক রয়েছে যা মানবধর্মশাস্ত্রের মূল ভাবধারাকে বিঘ্নিত করেছে এবং তার পর্যায়ক্রমিক স্রোতধারাকে বাধা প্রদান করেছে। মনুসংহিতার সেইসব অংশ যে পরবর্তীকালের রচনা অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশ তা সহজেই অনুমেয়। Buhler বলেছেন, '...interrupts the continuity of the text very needlessly।' আর্যাবর্তের সনাতন মানবধর্মে বহিঃশত্রু ও বিধর্মীদের আক্রমণের প্রভাবে সমাজজীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মনুসংহিতায় সেসব বহিরাগতদের উল্লেখ আছে। জনজীবনে ধর্ম-কর্ম এক সময় ব্রাহ্মণ সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণেরা কিছু ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং কিছু ক্ষেত্রে বিধর্মীদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষার জন্য বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা এবং নারীজাতির স্বাধীনতা খর্ব করে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বেশ কিছু শ্লোক মনুসংহিতাতে সংযুক্ত করে দেন। এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিই প্রাচীন মানবধর্মশাস্ত্রকে স্ববিরোধিতার কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মনুসংহিতার গবেষক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতায় উল্লিখিত ২/৬৬, ২/৬৭, ২/২১৩, ৫/১৫৪, ৫/১৫৫, ৫/১৫৬, ৫/১৫৭, ৫/১৬৪, ৫/১৬৮, ৯/২,। ৯/১৪, ৯/১৮, ৯/২২, ১১/৩৭ প্রভৃতি আরও অনেক শ্লোক (১৪৭১টি) রয়েছে যেগুলি বিশুদ্ধ মনুসংহিতাতে অনুপস্থিত। সনাতনী মানবধর্মশাস্ত্র বহুবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের পালা বদলের স্রোতধারায় প্রবহিত হয়ে বর্তমান মনুসংহিতার কলেবর ধারণ করেছে।

বর্তমানকালে কিছু মানুষ মনুসংহিতার ন্যায়-নীতি, বিধান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তা হলো হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে তাদের অসূয়াপ্রসূত মানসিকতার প্রতিফলন। আর কিছু মানুষ মনুকে সমালোচনা করে তাদের বামনবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন। আসলে বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতা পর্যন্তই তাদের বিচরণ পরিধি। তাদের আকাঙ্ক্ষিত কিছু বিষয় রূপান্তরিত মনুসংহিতাতে প্রাপ্তি ঘটলে উৎস সন্ধানের দুর্গম পথে পাড়ি দেবার প্রয়োজনীয়তা আর থাকে কি? মনুসংহিতার গর্ভগৃহ কোনটি? কীভাবে তার জন্ম? মনুসংহিতার পালাবদল যুগে যুগে কীভাবে ঘটল? এই রূপান্তরের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে তখনই প্রতিফলিত হয় যখন প্রকৃত সত্যকে জানার সৎসাহস থাকে এবং স্বজাতির পাণ্ডিত্যের প্রতি আস্থা থাকে। স্বধর্মবিদ্বেষীরা গোরুর গা ধোয়ানের তুলনায় শুয়োরের পা ধোয়ানোতে বেশি সম্মানবোধ করেন। নিজের পৌরুষত্বের পরিমাপ না করে তারা 'শিভ্যালরি'র কথা বলেন, নারীর সম্মান ও স্বাধীনতার বিষয়ে, বর্গবিভাজন বিষয়ে মনুকে সমালোচনা করেন এবং তাঁর সৃষ্ট মনুসংহিতাকে অগ্নিসংযোগে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাদের অজ্ঞতার অহমিকার বৃথা চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অগাধ সমুদ্রে খড়কুটোর মতো এমনভাবে তলিয়ে যায় যার 'ম্যানিফেস্টো' শিশুপাঠ্য কাহিনিতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। মনু যথার্থই বলেছেন— যার বাক্য ও মন শুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে যিনি সর্বদা সুরক্ষিত, তিনিই বেদশাস্ত্র আধারিত সমস্ত তত্ত্বের সমুদয় ফল লাভ করেন।

'যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগুপ্তে চ সর্বদা।

স বৈ সর্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্।।' (মনুসংহিতা; ১৬০)

(লেখক সহ-শিক্ষক (বাংলা বিভাগ), রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া)

দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট ৫.২৫ লক্ষ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের মধ্যে ৬৮ শতাংশ দেশীয় শিল্প থেকে সংগ্রহের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, এটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া-মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করবে। এই বাজেটে গবেষণা থেকে শুরু করে সীমান্ত পরিকাঠামো জোরদার করার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা হয়েছে...।

দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট হবে ৫.২৫ লক্ষ কোটি টাকা, এটি মোট বাজেটের ১৩.৩১শতাংশ। প্রতিরক্ষা পেনশনের জন্য ১.১৯ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারত তৃতীয় স্থানে হয়েছে। ৪০ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে সীমান্তে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য। ৯.৮ শতাংশ বৃদ্ধি প্রাক্তন সেনাদের পেনশন বাজেটে। যে কোনো দেশের কাছে শক্তিশালী সেনাবাহিনী অপরিহার্য। ভারত একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিরক্ষা পণ্য আমদানিকারক হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা পালটে শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গত বছর শীর্ষ ২৫ প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে ভারত। এছাড়াও, প্রতিরক্ষা খাতে স্বনির্ভরতা এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া-মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর প্রচারের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রতিরক্ষার জন্য মোট বরাদ্দের ৬৮ শতাংশ দেশীয় শিল্প থেকে সংগ্রহের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। গত অর্থ বছরে এটি ছিল ৫৮ শতাংশ। এতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দ্রব্য আমদানিতে নির্ভরশীলতা কমবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গবেষণা ও উন্নয়ন (আর অ্যান্ড ডি) বাজেটের এক চতুর্থাংশ 'প্রাইভেট প্লেয়ার'দের জন্য থাকবে, যার মধ্যে স্টার্টআপগুলিও রয়েছে। দেশীয় পণ্যের পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশনের জন্য একটি নোডাল এজেন্সি গঠন করা হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা পরিষেবাগুলির জন্য মূলধন ব্যয় (আধুনিকীকরণ এবং সংগ্রহের ব্যয়) ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নয় বছরের ব্যবধানে এটি প্রায় ৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা পেনশন-সহ মোট প্রতিরক্ষা বাজেট ১০৭.২৯ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৩-১৪ সালে বরাদ্দ ছিল ২.৫৩ লক্ষ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ সালে তা বেড়ে ৫.২৫ লক্ষ কোটি টাকা রয়েছে।

সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি করবে 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ'

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সীমান্তরেখায় ভারত নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হলেও কেন্দ্রীয় সরকার 'বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনে'র মূলধন ব্যয় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫০০ কোটি টাকা, এই বছর তা হয়েছে ৩৫০০ কোটি টাকা। এটি গুরুত্বপূর্ণ টানেল (সেলা এবং নেচিফু টানেল) এবং প্রধান নদীগুলির উপর সেতু নির্মাণ-সহ সীমান্ত পরিকাঠামো গঠনের গতি ত্বরান্বিত করবে। ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেখানে জনবসতি বিরল, সীমিত সংযোগ এবং পরিষেবা নামমাত্র রয়েছে, সেইসব গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্য ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম। প্রাথমিক পরিকাঠামো, বাড়িঘর, পর্যটন কেন্দ্র, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের সুবিধা চালু করা হবে। ডিটিএইচ-এর মাধ্যমে দূরদর্শন এবং শিক্ষামূলক চ্যানেল পৌঁছে যাবে।

পাশাপাশি এখানে জীবিকার জন্য একটি বিশেষ তহবিলও প্রদান করা হবে। এগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

ভারতের এই প্রথমবার ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র রপ্তানি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একদা ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অস্ত্রের ক্রেতা হিসাবে গণ্য করা হতো, সেই ভারত এখন অবস্থান পালটে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অধীনে দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ওপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোর দিয়েছিলেন, ফলে ভারত এখন বিশ্বের শীর্ষ পঁচিশটি অস্ত্র রপ্তানিকারকদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি পরিকল্পনায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ভারত গত মাসে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য প্রথম রপ্তানির সুযোগ পেয়েছে। ফিলিপিন্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস প্রাইভেট লিমিটেডের (বিএপিএল) সঙ্গে ৩৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যেখানে উপকূল ভিত্তিক অ্যান্টি-শিপ মিসাইল সিস্টেম সরবরাহ করা হবে। ভারত-রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে গঠিত বিএপিএল যারা সুপারসনিক করুজ মিসাইল ব্রহ্মোস তৈরি করে। এই মিসাইল সাবমেরিন, জাহাজ, বিমান বা ভূমি যে কোনো স্থান থেকে উৎক্ষেপণ করা যেতে পারে।

নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ : সমস্ত গাড়িতে ছয়টি এয়ারব্যাগ বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আটজন যাত্রী বহনকারী গাড়িতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সরকার একটি বড়ো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন থেকে গাড়ি নির্মাতাদের জন্য মোটর গাড়িতে ন্যূনতম ছ'টি এয়ারব্যাগ থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হবে। এর জন্য ১৪ জনুয়ারি খসড়া

বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে মন্ত্রক বলেছে যে দুর্ঘটনা পরবর্তী প্রভাব রোধ করতে গাড়ির যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য সেন্ট্রাল মোটর ভেহিক্যাল নিয়ম' (সিএমভিআর) ১৯৮৯ সংশোধন করে সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গাড়ির সামনে এবং পিছনের সারিতে বসে থাকা যাত্রীদের সামনের এবং পার্শ্বীয় সংঘর্ষের প্রভাব কমাতে এয়ারব্যাগগুলি ইনস্টল করা হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এমওয়ান গাড়ির বিভাগে চারটি অতিরিক্ত এয়ারব্যাগ বাধ্যতামূলক করা হবে— দুই পাশে/টরসো এয়ারব্যাগ এবং দুই পাশের পর্দা/টিভির এয়ারব্যাগগুলি সমস্ত আউটবোর্ড যাত্রীদের সুরক্ষিত করবে। এমওয়ান গাড়ি বলতে বোঝায় 'যাত্রী বহনের বেশি আসন থাকবে না।' সরকার চালকদের জন্য এয়রব্যাগ ২০১৯ সালের জুলাই থেকে এবং সামনের সহ-যাত্রীদের জন্য এয়ারব্যাগ এই বছরের জানুয়ারি থেকে বাধ্যতামূলক করেছে।

২০২১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে নয়টি খাতে মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর আর্থিক ত্রৈমাসিকে ন'টি নির্বাচিত ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ হয়েছে ৩.১০ কোটি, যা এপ্রিল-জুন মাসের তুলনায় দুই লক্ষ বেশি। এর মধ্যে উৎপাদন খাতের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি ৩৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের ত্রৈমাসিক কর্মসংস্থান সমীক্ষার (কিউইএস) দ্বিতীয় পর্যায়ে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

মহিলা কর্মীদের সামগ্রিক অংশগ্রহণ ৩২.১ শতাংশ হয়েছে, কিউইএসের প্রথম পর্যায়ে এটি ছিল ২৯.৩ শতাংশ, এবারে তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ন'টি ক্ষেত্রে হলো উৎপাদন, নির্মাণকাজ, বাণিজ্য, পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং রেস্তোরাঁ, আইটি/বিপিও এবং আর্থিক পরিষেবা।

২০২১ সালের এপ্রিল মাসে দেশে কোভিড-১৯ অতিমারির বিস্তার রোধে রাজ্যগুলি লকডাউন করেছিল, পরে বিধিনিষেধ তুলে নিলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়, সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

গত দু' বছরে ভারতের বনাঞ্চল বৃদ্ধি ২২৬১ কিলোমিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬ সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ২০৭০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো' অর্জনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন, তখন সমগ্র বিশ্ব ভারতের ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণাটি পরিবেশ সংরক্ষণের সাত বছরের প্রচেষ্টার সমাপ্তি চিহ্নিত করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছিল। অরণ্য সমীক্ষা ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুসারে গত দুই বছরে দেশের বনাঞ্চল ও গাছের আয়তন প্রায় ২২৬১ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব দ্বিবার্ষিক 'ইন্ডিয়া স্টেট অব ফরেস্ট রিপোর্ট' (আইএসএফআর) প্রকাশ করেছেন। সমগ্র দেশে বনাঞ্চলের অবস্থা পরীক্ষা করে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। ভূপেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, দেশের মোট বনাঞ্চল ও গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত অঞ্চল আছে ৮০.৯ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের ভৌগোলিক এলাকার ২৪.৬২ শতাংশ। অরণ্য সমীক্ষা ২০২১ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৯ সালের প্রতিবেদনের তুলনায় এখন ১৫৪০ বর্গকিলোমিটার বনভূমি এবং ৭২১ বর্গকিলোমিটার গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত অঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ (৬৪৭ বর্গকিমি) এবং তেলেঙ্গানা (৬৩২ বর্গকিমি) এবং ওড়িশা (৫৩৭ বর্গকিমি) এই তিন রাজ্যে বনভূমি সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকা অনুসারে, মধ্যপ্রদেশে ভারতের বৃহত্তম বনভূমি রয়েছে।

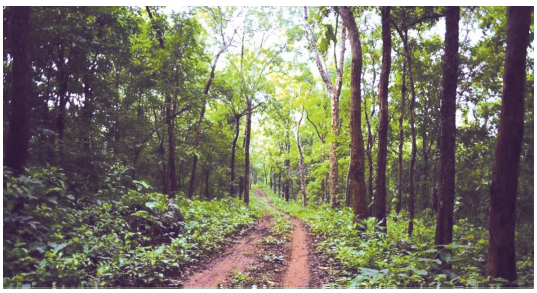

অরণ্য সমীক্ষার জন্য রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি এবং স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের তুলনায়, দেশে কার্বন মজুদ ৭৯.৪ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বনাঞ্চলে মোট ৭২৯৪ মিলিয়ন টন কার্বন মজুদ রয়েছে।

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্কে কাস্টমার বেস পাঁচ কোটির গণ্ডি অতিক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জনধন-আধার-মোবাইল (জেএএম) ভারতে ডিজিটাল আর্থিক সাক্ষরতার দরজা খুলে দিয়েছে তাই নয়, এটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেছে। তিন বছরের মধ্যে 'ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাঙ্ক' (আইপিপিবি) ৫০ মিলিয়ন গ্রাহকের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই ব্যাঙ্ক ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় ১.৪৭ লক্ষ 'ডোরস্টেপ ব্যাঙ্কিং' পরিষেবা প্রদানকারীর সহায়তায় আইপিপিবি ১.৩৬ লক্ষ পোস্ট অফিসে ডিজিটাল মোডে পাঁচ কোটি নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এর মধ্যে ১.২০ লক্ষ পোস্ট অফিস দেশের গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। অ্যাকাউন্টধারীদের ৫২ শতাংশ পুরুষ, ৪৮ শতাংশ মহিলা। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার কর্মচারীর অধ্যবসায়। তাঁরা বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি চালিয়ে এই সাফল্য এনে দিয়েছেন।

কেভাদিয়া স্টেশনের নাম হয়েছে একতা নগর রেলওয়ে স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সর্দার বল্লভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু অব ইউনিটি' বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি কেভাদিয়ায় অবস্থিত। এখন এর সঙ্গে নতুন পরিচয় যুক্ত হয়েছে, কারণ কেভাদিয়া রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে একতা নগর রেলওয়ে স্টেশনের 'স্টেশন কোড' হবে ইকেএনআর, এবং এর সংখ্যাসূচক কোড হবে ০৮২২৪৬২০। স্ট্যাচু অব ইউনিটির আশেপাশের অঞ্চলে আলাদা বিল্ডিং, মল, নার্সারি ও বাগান, একতা শব্দটি দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সর্দার প্যাটেলের জন্মদিন জাতীয় ঐক্য দিবস হিসেবেও পরিচিত। প্রধানমন্ত्री নরেন্দ্র মোদী গত বছর জানুয়ারিতে এই রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধন করেন এবং এখান থেকে সারা দেশের আটটি শহরে সরাসরি রেল পরিষেবার সূচনা করেন।

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২৫।।

বিখ্যাত আইনজীবী বিশ্বনাথ কেলকর একদিন ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর ডাক্তারজী বললেন—

আমি এখনই আসছি—

বউদি দু'কাপ চা বানিয়ে দিন না।

কিন্তু চা এল না।

কি ব্যাপার! আমি একবার দেখে আসি।

ডাক্তারজী আবার রান্নাঘরে গেলেন।

চা চিনি কিছুই নেই।

আমি এখনই পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আনছি।

বউদি আপনি ওগুলো রাখুন।

কেলকরজী বুঝতে পারলেন কী হয়েছে। গুরুজীকে দেখতে পেয়ে বললেন—

ডাক্তারজীর কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করুন।

একাদশী কীভাবে শিবরাত্রিকে সাহায্য করতে পারে?

আমি মাসে পঁচিশ টাকা করে দেব।

ডাক্তারজী আপনার বন্ধু। টাকার কথা আপনিই ওঁকে বলুন।

গুরুজী জানতেন, ডাক্তারজীকে টাকা দেবার সাহস কেলকরজীর হবে না।

চলবে